দিঘির জলে কার ছায়া গো

হুমায়ূন আহমেদ

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

১. বুধবার হলো মুহিবের মিথ্যাদিবস 2
২. টেলিফোনে লীলা কাউকে হ্যালো বলে না 33
৩. রাতে বৃষ্টিতে ভিজে 60
৪. তিনটা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় 91
৫. আবার পত্রিকার প্রথম পাতায় 114
৬. ক্রিমিনাল লইয়ার হামিদুজ্জামানের চেম্বারে 131
৭. ব্রাউন পেপারে মোড়া টাকা 145
৮. লীলার হাতে ফুলের মালা 149

১. বুধবার হলো মুহিবের মিথ্যাদিবস

উৎসর্গ

কন্যা লীলাবতীকে

এই উপন্যাসের নায়িকা লীলা। আমার মেয়ে লীলাবতীর নামে নাম। লীলাবতী কোনোদিন বড় হবে না। আমি কল্পনায় তাকে বড় করেছি। চেষ্টা করেছি ভালোবাসায় মাখামাখি একটি জীবন তাকে দিতে। মা লীলাবতী! নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।

————

ভালোবাসা কী?

Theory of relativity has nothing to do with it.–আইনস্টাইন

Soft version of sexual attraction.–শোয়েডিঞ্জার (কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের জনক)

ভালোবাসাই ঈশ্বর।–ম্যাথমেটিশিয়ান অ্যাবেল

————-

০১.

আজ বুধবার।

বুধবার হলো মুহিবের মিথ্যাদিবস। মিথ্যাদিসে রাত এগারোটা উনষাট মিনিট পর্যন্ত সে মিথ্যা কথা বলে। তার এই ব্যাপারটা একজন শুধু জানে। সেই একজনের নাম লীলা। লীলার বয়স একুশ। সে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার। বিষয় ইংরেজি সাহিত্য।

লীলার সবই সুন্দর। চেহারা সুন্দর, চোখ সুন্দর, মাথার কোঁকড়ানো চুল সুন্দর। ক্লাসে তার একটা নিক নেম আছে— সমুচা। এমন রূপবতী একটা মেয়ের নাম সমুচা কেন সেটা একটা রহস্য। নাম নিয়ে লীলার কোনো সমস্যা নেই। সে বন্ধুদের টেলিফোন করে নির্বিকার ভঙ্গিতে বলে, আমি সমুচা বলছি।

মুহিবের বয়স ত্রিশ। গায়ের রঙ কালো। বেশ কালো কালো ছেলেদের ঝকঝকে সাদা দাঁত হয়। মুহিবের দাঁত ঝকঝকে সাদা। পেপসোডেন্ট টুথপেস্ট কোম্পানি একবার তাকে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের জন্যে সিলেক্ট করেছিল। ডিরেক্টর সাহেব তাকে দেখে বললেন, এই ছেলের চেহারায় তো কোনো মায়া নেই। চোখ এক্সপ্রেশনলেস। একে দিয়ে হবে না।

মুহিব বলল, স্যার, আপনাদের তো মায়ার দরকার নেই। আপনাদের দরকার দাঁত। আমার দাঁত দেখুন। আমি আস্ত সুপারি দাঁত দিয়ে ভাঙতে পারি। একটা সুপারি অনুন, দাঁত দিয়ে ভেঙে দেখাচ্ছি। দশ সেকেন্ডের মামলা।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, বাসায় চলে যাও। বাসায় গিয়ে দাঁত দিয়ে সুপারি ভাঙ। ফাজিল ছোকরা।

মুহিব বিএ পাশ করেছে আট বছর আগে। একবারে সম্ভব হয় নি। দুবার পরীক্ষা দিয়ে থার্ড ডিভিশন পেয়েছে। রেজাল্ট বের হবার পর মুহিবের বাবা (আলাউদ্দিন আহমদ) ছেলেকে বললেন, বিএ-তে থার্ড ডিভিশন ফেলের চেয়েও খারাপ। কেউ রেজাল্ট জিজ্ঞেস করলে বলবি, ফেল করেছি।

মুহিব বাধ্য ছেলের মতো মাথা কাত করে বলল, জি আচ্ছা।

আলাউদ্দিন বললেন, থার্ড ক্লাসের সার্টিফিকেটটা হাতে আসলে ছাগলকে কাঠালপাতার সঙ্গে খেতে দিবি। থার্ড ক্লাস সার্টিফিকেট ছাগলের খাদ্য।

মুহিব বলল, ছাগল কোথায় পাব?

আলাউদ্দিন বললেন, খুঁজে বের করবি ঢাকা শহরে ছাগলের অভাব আছে?

মুহিব বলল, জি আচ্ছা।

আলাউদ্দিন বললেন, সকালে আমার সামনে। খবরদার পড়বি না তোর মুখ দেখে দিন শুরু হওয়া মানে দিনটাই নষ্ট। নিজের ঘরে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকবি। আমি ঘর থেকে বের হলে রিলিজ হবি। মনে থাকবে?

থাকবে।

এখন সামনে থেকে তার সঙ্গে কথা বলা মানে আয়ুক্ষয়।

মুহির বাবার সামনে থেকে বের হয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। রান্নাঘরে মুহিবের। মা রাজিয়া বেগম রান্না বসিয়েছেন! এই মা মুহিবের সংসা। ভদ্রমহিলা সরুল। প্রকৃতির। মুহিবকে অসম্ভব পছন্দ করেন। তিনি বললেন, এই গাধা! কদমবুসি করেছিস?

মুহিব বলল, কদমবুসি করব কেন?

বিএ পাশ করেছিস, কদমবুসি করবি না? বিএ পাশ হওয়া সহজ কথা? কয়টা ছেলে আছে বিএ পাশ?

মুহিব মাকে কদমবুসি করল।

রাজিয়া বললেন শাড়ির আঁচলে তিন টাকা আছে]একশ টাকা নিয়ে যায় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মিষ্টি খাব। আমার হাত বন্ধ।

মুহিব শাড়ির আঁচল খুলে। তিনশ টাকার পুরোটাই নিয়ে নিল।

রাজিয়া বললেন, চুপ করে বসে থাকা বান্না শেষ করি। তারপরে হাত ধুয়ে তোর মাথায় হাত রেখে দোয়া করব। মায়ের দোয়া ছাড়া সন্তানের কিছু হয় না

মুহিব বলল, তুমি তো আমার মা না।

রাজিয়া বললেন-থাপড়ায়েত ফেলে দিব বদমাশ ছেলে। আমি মানাতো মা কে?

মুহিব ঝিম ধরে বসে রইল। মহিলা রান্না শেষ করে অজু করলেন। মুহিবের মাথায় হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহপাক, এই ছেলেটা সত্যিকার মায়ের আদর কী জানে না। তুমি তার উপর দয়া কর।

মুহিব বিরক্তালীয় বলদ, এটা কী বললো মা!তুমি যে আদর কর এটা মিথ্যা?

মিথ্যা হবে কেন?

সত্যিকার মায়ের আদর কি তোমার আদরের চেয়ে আলাদা?

রাজিয়া বেগম চুপ করে গেলেন। কী বলবেন বুঝতে পারছেন না।

মুহিব বলল, আল্লাহপাকের সঙ্গে কথা বলছ, জেনে বুঝে বলবে না।

রাজিয়া বিব্রত গলায় বললেন, কী বলব বলে দে।

মুহিব বলল, তুমি বলো আমার এই ছেলেকে যেন কেউ দয়া না করে। উল্টা সে যেন সবাইকে দয়া করতে পারে।

রাজিয়া বেগম তোতাপাখির মতো বললেন, আমার এই ছেলেকে যেন কেউ দয়া না করে। উল্টা সে যেন সবাইকে দয়া করতে পারে।

মুহিবের চরিত্র বোঝার জন্যে তার একটা ঘটনা উল্লেখ করা জরুরি। সে বিএ সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পর সত্যি সত্যি ছাগলকে দিয়ে সার্টিফিকেট খাইয়েছে। কোরবানি দেবার

জন্যে আলাউদ্দিন তিনহাজার চারশ টাকায় একটা ছাগল কিনেছিলেন। লবণ মাখিয়ে সার্টিফিকেটটা তার সামনে ধরতেই ছাগল খেতে শুরু করল। আলাউদ্দিন বললেন, ছাগলকে কী খাওয়াচ্ছিস?

মুহিব বলল, বিএ সার্টিফিকেটটা খাওয়াচ্ছি। আরাম করে খাচ্ছে বাবা।

আলাউদ্দিন বললেন, বিএ সার্টিফিকেটটা খাওয়াচ্ছিস মানে?

মুহিব বলল, তুমি খাওয়াতে বলেছিলে। ভুলে গেছ?

আলাউদ্দিন ছুটে এসে অর্ধেক সার্টিফিকেট ছাগলের মুখ থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি সার্টিফিকেট উদ্ধার করেই ক্ষান্ত হলেন না। সেটা বাধাই করে নিজের শোবার ঘরে টাঙিয়ে রাখলেন। যেদিন টাঙালেন সেদিন বাসার সবাইকে ডেকে এনে বললেন— অর্ধেক সার্টিফিকেট টাঙিয়ে রেখেছি কী জন্যে জানো? সবাইকে একটা জিনিস বোঝানোর জন্যে। সেটা হচ্ছে, সার্টিফিকেটের মতো আমার পুত্রও অর্ধমানব।

এখন মুহিবদের পরিবার সম্পর্কে বলা যাক। মুহিবের বাবা আলাউদ্দিন একটা গার্লস স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এখন নিজেই মেয়েদের একটা কোচিং সেন্টার চালান। নাম আলাউদ্দিন কোচিং। কোচিং সেন্টারের মেয়েরা তাকে ডাকে বক্ষ-স্যার। কারণ তিনি নাকি মেয়েদের চোখের দিকে তাকিয়ে পড়ান না। বুকের দিকে তাকিয়ে পড়ান। তার কোচিং সেন্টারের যথেষ্ট সুনাম আছে। তিনি নিজেও ইংরেজি খুব ভালো পড়ান।

অবসর সময়ে আলাউদ্দিন গান লেখেন। বেতার এবং টিভির তিনি একজন এনলিস্টেড গীতিকার। বাজারে তার দুটি বইও আছে— ঈশ্বর ও ধর্ম এবং কোরানের আলোকে বিজ্ঞান। কোচিং সেন্টারের ছাত্রীদের বই দুটি কেনা বাধ্যতামূলক।

আলাউদ্দিনের প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভের সন্তান তিনজন। বড় দুই মেয়ের পর মুহিব। বড় দুই মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। প্রথমপক্ষের স্ত্রীর নাম শেফালী। তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রকৃতস্থ। ভাইয়ের সঙ্গে থাকেন।

দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী রাজিয়া বেগমের একটি সন্তান, নাম অশ্রুমালা। ডাকা হয় অশ্রু। অশ্রু বাবার কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করছে। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি। কোচিং সেন্টারে অশ্রুর নাম হয়েছে কাউয়া। যদিও তার গায়ের রং শাদা। যথেষ্ট রূপবতী। বড় বড় চোখ। কাটা কাটা নাকমুখ।

অশ্রুর চরিত্রের বিশেষত্ব হচ্ছে, সে প্রায়ই সন্ধ্যার পর বাড়িতে ভূত দেখে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়। একটা ভূতকেই সে দেখে। পুরুষ ভূত। নগ্ন থাকে। সে বিশেষ উদ্দেশ্যে অশ্রুকে জড়িয়ে ধরতে চায়।

বুধবার সকাল দশটা। মুহিব লীলাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

লীলাদের বাড়ির কলিংবেল তিনমাস ধরে নষ্ট। চাপ দিলেই ইলেকট্রিক শক খেতে হয়। লীলা কলিংবেলের ওপর লালকালি দিয়ে একটা নোটিশ টাঙিয়েছে।

সাবধান

কলিংবেল নষ্ট। চাপ দিলেই শক খাবেন।

দয়া করে কড়া নাড়ুন।

কলিংবেল সারানো কোনো ব্যাপার না। মোড়ের ফ্যানের দোকানের একজন মিস্ত্রি ধরে নিয়ে এলেই সে কাজটা করে দেবে। লীলার বাবার কারণে কাজটা করা হচ্ছে না। বাড়ির যাবতীয় কাজকর্মে তার নিজের পরিকল্পনা থাকে। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, কলিংবেল সারননা কোনো বিষয় না। এর জন্যে মিস্ত্রিকে একশ টাকা দেবার কোনো মানে হয় না। কাজটা তিনি নিজেই করবেন। তিনি আজিজ মার্কেট থেকে একটা বই কিনে এনেছেন। বইয়ের নাম ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি সারাই। গত তিনমাস ধরে তিনি মন দিয়ে বইটা পড়ছেন। তার বাড়িতে কারেন্ট Two phase না-কি One phase এই নিয়ে তিনি সামান্য বিভ্রান্ত। পুরো বইটা তার একবার পড়া হয়েছে। এখন তিনি দ্বিতীয়বার পড়ছেন।

লীলার বাবার নাম শওকত চৌধুরী। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে রিটায়ার করেছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিরা মামলার গল্প করে বাকি জীবন কাটান। ইনি সেরকম না। বিচারক থাকার সময় তিনি আইনের বই ছাড়া কিছু পড়েন নি। এখন তার বাইরের বই পড়ার অভ্যাস হয়েছে। যে-কোনো বিষয় নিয়ে পড়তে তার ভালো লাগে। তিনি পড়েই ক্ষান্ত হন না, পাঠের বিদ্যা কাঙে লাগানোর চেষ্টা করেন। নীরোগ শরীর, সুস্থ জীবন এবং ঘরে বসে হোমিওপ্যাথ এই দুটি বই পড়ে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় উৎসাহী হয়েছেন। ওষুধপত্র জোগাড় করেছেন। কালো চামড়ার ব্যাগ কিনেছেন। স্টেথিসকোপ কিনেছেন। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে ওষুধ দেন। মুহিব ছাড়া তেমন কেউ তার কাছে ওষুধ নিতে

আসে না। মেয়ের ছেলেবন্ধুকে কোনো বাবাই সহ্য করতে পারেন না। শওকত তার ব্যতিক্রম। তিনি মুহিবকে অত্যন্ত পছন্দ করেন।

কলিংবেলের ওপর লেখা নোটিশটা মুহিব অনেকবার পড়েছে। আজও আবার পড়ল। শুধু যে পড়ল তা-না, হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখল। লীলা নিজের হাতে লাল মার্কার দিয়ে লিখেছে। লেখায় তার স্পর্শ লেগে আছে। লেখাটা লীলা চিন্তা করে লিখেছে। চিন্তাটার জন্য তার মাথার ভেতরের মস্তিষ্কে। কলিংবেলে হাত রাখার অর্থ লীলার মাথার ভেতর হাত রাখা।

মুহিব কলিংবেল চাপল এবং বড় ধরনের শক খেল। সে জানে কলিংবেল চাপা মানেই শক খাওয়া। তারপরেও গত তিন মাসে সে ইচ্ছা করেই অসংখ্যবার শক খেয়েছে। ইচ্ছা করে শক খাওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে। মুহিব কারণটা জানে না।

শওকত দরজা খুললেন এবং আনন্দিত গলায় বললেন, হ্যালো ইয়াং মান। ইউ আর লুকিং গ্রেট।

মুহিব বলল, চাচা, কেমন আছেন?

ভালো আছি। খুবই ভালো আছি। লীলা বাসায় নেই। ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে।

মুহিব বলল, আমি লীলার কাছে আসি নি চাচা। আপনার কাছে এসেছি। অমাির মায়ের ওষুধ দরকার। বারবার আপনাকে বিরক্ত করি। এত লজ্জা লাগে! আমার মা আবার আপনার ওষুধ ছাড়া অন্য ওষুধ খাবেন না।

শওকতের মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। তিনি মুহিবের কাঁধে হাত রেখে বললেন, দরজায় দাঁড়িয়ে তো ওষুধ দেয়া যায় না। ভেতরে এসে বসো। হোমিওপ্যাথি কঠিন বিদ্যা। এলোপ্যাথির মতো না যে, অসুখ হলো, কী অসুখ বলার আগেই ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দিল। অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ পড়া মাত্র কী হয় জানো?

কী হয়?

আমাদের লোয়ার ইনটেশটাইনের সব উপকারী জীবাণু মরে সাফ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ডায়রিয়া।

মুহিব বলল, উপকারী জীবাণু আছে নাকি?

শওকত বললেন, অবশ্যই আছে। They are our friends. আমরা কী করি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে বন্ধুদের মেরে ফেলি। What a pity! এসো, ভেতরে এসো। সোজা আমার স্টাডি রুমে চলে যাও। আমি কেইস স্টাডির খাতাটা নিয়ে আসি। তোমার মায়ের নাম রাজিয়া বেগম। তাই না?

জি চাচা।

স্টাডি রুমে মুহিব এবং শওকত সাহেব। দুজনে মুখোমুখি বসা। শওকত সাহেবের হাতে পাঁচশ পাতার চামড়ায় বাঁধানো মোটা খাতা, চামড়ায় সোনালি রঙ দিয়ে লেখা

Case Study Book

S. Chowdhury

শওকত বললেন, এই যে পাওয়া গেছে। পেশেন্টের নাম রাজিয়া বেগম। বয়স পঞ্চাশ। মিডিয়াম হাইট। গাত্রবর্ণ গৌর। ঠিক আছে?

মুহিব বলল, জি চাচা।

শওকত খাতা পড়তে পড়তে বললেন, পানি পানে অনীহা। অল্প ভোজনে আগ্রহী। নিদ্রায় সমস্যা। ঠান্ডার ধাত।

মুহিব বলল, সব ঠিক আছে চাচা।

শওকত বললেন, এক বছর আগের এন্ট্রি তে। এর মধ্যে কিছু Change হতে পারে। সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছি। আপটুডেট থাকা দরকার। আছে কোনো চেঞ্জ?

মুহিব বলল, রাগ মনে হয় সামান্য বেড়েছে। আগে কারো সঙ্গেই রাগারাগি করতেন না। এখন বাবার সঙ্গে করেন।

শওকত বললেন, কী লিখব? খিটখিটে মেজাজ?

মুহিব বলল, খিটখিটে মেজাজ বলা ঠিক হবে না। মা খুবই শান্ত স্বভাবের। বাবার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। আগেও হয় নি। তা নিয়ে মা কিছু বলতেন না, এখন বলেন।

শওকত বললেন, সমস্যা কী বলে?

মুহিব বলল, আধকপালি মাথাব্যথী।

ডান দিক না বাঁ দিক?

ডান বামের জন্যে ওষুধ আলাদা হবে?

অবশ্যই। হোমিওপ্যাথি যে কত জটিল চিকিৎসা তোমাদের কোনো ধারণা নেই। আইনের ব্যাখ্যার চেয়েও জটিল। যাই হোক, তুমি রান্নাঘরে চলে যাও। আমাকে এককাপ চা বানিয়ে দিয়ে যাও। কাজের মেয়েটা দুদিনের ছুটি নিয়ে গেছে। আজ দশদিন। বিরাট ঝামেলায় পড়েছি।

রান্নাবান্না কে করে?

লীলা যা পারে করে। আমি নিজেও কয়েকদিন ভাত রান্না করলাম। ভেরি ডিফিকাল্ট জব। আতপ চাল রান্নার এক রেসিপি, আবার সিদ্ধচাল রান্নার অন্য রেসিপি। পুরনো চাল একভাবে রাঁধতে হয়, আবার নতুন ধানের চাল অন্যভাবে। রাইস কুকার ছিল। ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়েল হারিয়ে ফেলেছি বলে সেটাও ব্যবহার করতে পারছি না।

মুহিব চা বানাতে গেল। রান্নাঘরের অবস্থা ভয়াবহ। বেসিনভর্তি আধোয়া বাসনপত্র। মেঝে নোংরা হয়ে আছে। মুহিব চা বানিয়ে দিয়ে এসে বাসনপত্র ধুয়ে পরিষ্কার করল। মেঝে

মুহুল! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে সে যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছে। তার মনে হলো, বাসাবাড়িতে চাকরের কাজ নিলে তার জব স্যাটিসফেকশনের সমস্যা হতো না।

লীলার শোবার ঘর হাট করে খোলা। মুহিব সেই ঘরও ঝাট ছিল। বিছানার চাদর বদলে দিয়ে বালিশের ওপর গতরাতে লেখা চিঠি রেখে দিল। সে এ বাড়িতে এসেছিল লীলাকে চিঠিটা দিতে। মুহিব লিখেছে–

লীলা,

পরশু রাতে আমাদের বাসায় একটা ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটা তোমাকে জানাবার জন্যেই চিঠি। ইদানীং কালে আমার এই সমস্যা হয়েছে। বাসায় যা-ই ঘটে তোমাকে জানাতে ইচ্ছা করে। আমি জানি এটা মেয়েলি স্বভাব। মেয়েরাই ঘরের কথা প্রিয়জনদের জানাতে আগ্রহ বোধ করে। ছেলেরা তেমন করে না।

যাই হোক, ঘটনাটা বলি। বাবা মার ওপর কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে রাগ করেছেন। রাগ করে তিনি মাকে অতি নোংরা কিছু বললেন। আমার বাবা এমএ পাশ একজন মানুষ। স্কুলের রিটায়ার্ড হেডমাস্টার। এবং একজন গীতিকার। তোমাকে আগে বুলি নি, বাবা কিন্তু বাংলাদেশ বেতারের একজন এনলিস্টেড গীতিকার। তাঁর অসাধারণ প্রেমের গান তুমি হয়তো শুনেছ—

চাঁদবদনী সুজন সখি
নিশি রাইতের পাখি
কেন করে ডাকাডাকি?

মহান প্রেমসঙ্গীত রচয়িতা বাবা মাকে নোংরা কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। তিনি বললেন, এক্ষুনি বাসা থেকে বের হ। এই মুহূর্তে।

মা ভেতরের বারান্দায় পেয়ারা গাছের নিচে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তুমি তো কখনো আমাদের বাসায় আস নি। আমরা উত্তরখান বলে শহরের বাইরে থাকি। চারকাঠা জমিতে টিনের বাড়ি। নেংটির বুকপকেটের মতো বাড়িটার নাম রাজিয়া মহল। রাজিয়া আমার মায়ের নাম। আমাদের বাসাটা বেশ বড়। ভেতরের দিকের উঠানে অনেকখানি জায়গা। বড় একটা পেয়ারা গাছ এবং কাঁঠাল গাছ আছে। দুটা গাছের কোনোটাতেই কখনো ফল ধরে না।

রাত এগারোটার দিকে বাবা শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমুতে গেলেন, তখন আমি মার কাছে গেলাম। শান্ত গলায় বললাম, মা, ঘরে চল। আমার সঙ্গে ঘুমুবে।

মা বললেন, না।

সারারাত পেয়ারা গাছের নিচে হাঁটাহাঁটি করবে?

মা জবাব দিলেন না। আমি মাকে পাজাকোলা করে তুললাম। মা বললেন, কী করিস, ফেলে দিবি তো!

আমি বললাম, ফেলব না।

রাতে মা আমার ঘরে থাকলেন। আমার ঘরের খাটটা ছোট। তাকে খাটে শুইয়ে আমি মেঝেতে পাটি পেতে ঘুমালাম। গল্পটা এখানেই শেষ না। সকালবেলা বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন না। ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে কথা বলেন। এবং কথা বলার সময় হেডমাস্টারের মতো গলা বের করেন।

আছিস কেমন?

জি বাবা ভালো আছি।

চাকরি খুঁজছিস?

জি।

থার্ডক্লাস বিএ-কে কে চাকরি দেবে? ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভার হয়ে যা। বড়লোকের গাড়ি চালাবি। তেল চুরি করবি। গ্যারাজের সাথে বন্দোবস্ত করে রাখবি। ওরা তোকে কমিশন দেবে। পারবি না?

পারব।

মাঝে মধ্যে বখশিসও পাবি। বাপের ঘাড়ে বসে জীবন পার করে দেয়া তো কাজের কথা না। শরীরও হচ্ছে মহিষের মতো। কাল রাতে জানালা দিয়ে দেখলাম, তোর মাকে কোলে নিয়ে ঘরে যাচ্ছিস। তোর কোনো কাজেই আমি সন্তুষ্ট হই না। এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি।

এই বলেই বাবা দুটা পাঁচশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। বাবার মতো হাড়কৃপণ মানুষ এক হাজার টাকা কাউকে দিবে তার প্রশ্নই ওঠে না। আমি নোট দুটা নিলাম।

লীলা, তোমার কাছ থেকে এক হাজার টাকা ধরি নিয়েছিলাম, সেটা শোধ দিয়ে দিলাম। খামের ভেতর এক হাজার টাকা নিশ্চয়ই পেয়েছ?

আজ এই পর্যন্ত।

মুহিব পুনশ্চ : তোমার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা ছিল। আমার মোবাইলে কোনো টাকাপয়সা নেই।

লীলাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই মুহিবের মোবাইল টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, তুমি কি সারভেন্টশ্রেণীর কেউ? কে তোমাকে ঘর পরিষ্কার করতে বলেছে? বাসন মজিতে বলেছে?

সরি।

তুমি ধীরে ধীরে সারভেন্ট সম্প্রদায়ের একজনে পরিণত হচ্ছ।

তা মনে হয় হচ্ছি।

আর আমি কি বলেছি এক হাজার টাকা ফেরত দাও? বলেছি?

না, বলো নি।

কবিতাটা মুখস্থ করেছ?

কোন কবিতা?

রবীন্দ্রনাথের বর্ষাযাপন কবিতাটা মুখস্থ করতে বলেছিলাম।

ভুলে গেছি। [এটা মিথ্যা কথা। অর্ধেক মুখস্থ হয়েছে। আজ বুধবার মিথ্যাদিবস। এই দিবসে মিথ্যা বলা যায়।]

Home-এর ডেফিনেশন মনে আছে?

আছে। Home is the place where if you want to go there they have to take you in.

কার কথা বলো?

রবার্ট সাহেবের।

রবার্ট সাহেবের না। রবার্ট ফ্রস্টের। কবি রবার্ট ফ্রস্ট। বলো রবার্ট ফ্রস্ট।

রবার্ট ফ্রস্ট।

লীলা বলল, তোমাকে আমি মানুষের সামনে Presentable করতে চাচ্ছি।

মুহিব বলল, কোনো লাভ হবে না। আমি যা তাই থাকব।

তুমি যা তা থাকছ না। তুমি ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছ।

মুহিব বলল, তোমাদের ড্রাইভারের নাম জলিল না?

হ্যাঁ। ড্রাইভারের নাম দিয়ে কী হবে?

মুহিব বলল, তাঁকে বলো তো আমার জন্যে একটা চাকরি দেখতে।

লীলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, সে কী চাকরি দেখবে?

মুহিব বলল, ড্রাইভারের চাকরি। আমি ঠিক করেছি ড্রাইভিং স্কুলে ভর্তি হব।

লীলা টেলিফোন কেটে দিল।

মহিবের নিজেকে হিমর মতো লাগছে। পকেট খালি। সে ঘটছে। তার গাঁয়ের শার্টটাও হলদ। কোনো একদিন হিমুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলে ভালো হতো। তাকে নিয়ে জঙ্গলে

জোছনা দেখতে যেত। তবে কাব্যভাব তার মধ্যে একেবারেই নেই। লীলার মধ্যে আছে। হঠাৎ তার টেলিফোন আসবে, আজ যে পূর্ণিমা জানো?

না, জানি না।

সন্ধ্যার পর বাসায় চলে এসো, চাঁদ দেখব/]ছাদেশতরঞ্চি পেতেছি।

হা করে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার কিছু নেই।

একজন আবৃত্তিকারকেখবর দিয়েছি। তিনি কবিতা আবৃত্তি করবেন।

গান শোনা যায় কবিতা শোনার কিছু নেই।

প্লিজ এসো। প্লিজ।

আচ্ছা আসছি।

রাতে খেয়ে যাবে।

কী রান্না?

বাইরে থেকে খাবার আসরে। প্লেন পোলাও আর খাসির রেজালা তুমি সন্ধ্যা ছটার মধ্যে আসবে

আচ্ছা।

মুহিব যায় না লীলা তাকে যেন টেলিফোনে ধরতে না পারে তার জন্যে মোবাইল অফ করে রাখে। এই কাজটা সে করে হিমুর কুখী মনে করে। হিমু রূপার সঙ্গে এইরকম কাণ্ড করে মুখে বলে যাবে। কিন্তু যায়াল।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মুহিব একটা চায়ের দোকানে অশ্রিয় নিয়েছে। পকেটে। টাকা থাকলে এককাপ চা খাওয়া যেত। হিমরা এমন অবস্থায় চা খেতে ইচ্ছা হলে। বলত—আছেন কোনো সহৃদয়ভাই যে একজন তৃষ্ণার্তকে চা খাওয়াবেন?

এধরনের কথা বলা সম্ভব হচ্ছেনা। মুহিববৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মুহিবের মোবাইলআবার বেজোউঠেছোলীলার টেলিফোন মুহিব সেট বন্ধ করল চারপাশে একগাদা লোক নিয়ে লীলার সঙ্গে কথা বলা যায় না।

লীলার সঙ্গে মুহিবের পরিচয়ের গল্পটা এখন। বলা যেতে পারে। তাদের পরিচয় নর্দমায় ঘিটনাটাএরকম—মুহির হেঁটেবাসায় ফিরছে।ধানমণ্ডি ২নম্বর রোডে মানুষজনের জটলা। মনে হচ্ছে দুবাই কিছু একটা দেখে মজা পাচ্ছে। বিনা পয়সায় মজা পাবার লোভ কেউ ছাড়েন। মুহিব এগিয়ে গেল।

মজা পাবার মতোই ঘটনা অতিরূপবতীএক তরুণী নর্দমায় পড়ে গেছে। তার সারা শরীর নর্দমার নোংরা বিষাক্ত ঘন কৃষ্ণবর্ণের তরলে মাখামাখি। মেয়েটার উচিত নর্দমা থেকে

ওঠার চেষ্টা করা। তা না করে নর্দমার নোংরীয় কী যেন খুঁজছে। সে ফিতাবিহীন স্পঞ্জের একটা স্যান্ডেল তুলল। জনতার ভেতর একজন চেঁচিয়ে উঠল, পাইছে পাইছে। জিনিস পাইছে। সবাই হেসে উঠল।

মুহিব নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, উঠে আসুন।

জনতার একজন বলল, ভাই, থাকুক না। খেলতেছে।

আবারো সম্মিলিত হাসি।

মুহিব বলল, হাত ধরুন, উঠে আসুন। মেয়েটা উঠে এসে বলল, আমার একটা বই নর্দমায় পড়ে গেছে। খুব জরুরি বই। বইটা খুঁজছিলাম।

মুহিব নর্দমায় নেমে পড়ল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বই নিয়ে উঠে এল। বইটার নাম– New Enlarged Anthology of Robert Frosts Poems.

মেয়েটা বলল, আমার পা কেটে গেছে, আমাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। তার আগে একটা সাবান কিনে নিয়ে আসুন, আমি লেকের পানিতে গোসল করব। গা থেকে বিকট দুর্গন্ধ আসছে। আর কিছুক্ষণ এই দুর্গন্ধ থাকলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব।

মহিব সাবান কিনে আনল। মেয়েটা সারা গায়ে সাবান ডলে লেকের পানিতে গোসল করল। মুহিবকে বলল, আপনি আশেপাশে থাকুন। আমি সাঁতার জানি না। পা পিছলে বেশি পানিতে পড়ে গেলে টেনে তুলবেন। আর বইটা ধুয়ে ফেলুন। বইটা আমার মা আমার

পঞ্চম জন্মদিনে দিয়েছিলেন। এটা তার স্মৃতিচিহ্ন। আমি যেখানেই যাই এই বই সঙ্গে থাকে। বইটার দ্বিতীয় পাতায় আমার মায়ের লেখাটা মুছে গেছে কি-না দেখুন তো।

মুহিব পাতা উল্টাল। নর্দমার নোংরা বইটার মলাটে লেগেছে। ভেতরটা ঠিক আছে। দ্বিতীয় পাতায় লেখা–

লীলাবতী মা মণি!
বড় হয়ে এই বইটা পড়বে। ঠিক আছে মা?
চাঁদের কণা। লক্ষ্মী সোনা। ঘুটঘুট। পুটপুট।
আমার মা হুটহুট।

মুহিব বলল, আপনার নাম লীলাবতী?

লীলা গায়ে সাবান ডলতে ডলতে বলল, হুঁ।

মুহিব বলল, আপনার মা লিখেছেন— আমার মা হুটহুট। হুটহুট মানে কী?

হুটহুটের কোনো মানে নেই। এটা হলো Nonsence Rhyme.

ননসেন্স রাইমটা কী?

লীলা বলল, ননসেন্স রাইম হলো অর্থহীন ছড়া। কোনো অর্থ হবে না, কিন্তু ভালো লাগবে। অন্তমিল থাকবে, ছন্দ থাকবে।

লীলার পা ভালোই কেটেছিল। দুটা স্টিচ লাগল। ডাক্তার ধনুষ্টংকারের ইনজেকশন দিলেন। অ্যান্টিবায়োটিক দিলেন। মুহিব লীলাকে তার বাসায় পৌঁছে দিল। লীলা বলল, আজ আপনি বাসায় ঢুকবেন না। আগামীকাল ঠিক এই সময় আসবেন।

মুহিব বলল, আগামীকাল আসব কেন?

লীলা বলল, দরকার আছে। অবশ্যই আসবেন।

মুহিব পরদিন গেল। লীলা গাভর্তি গয়না পরে বসে আছে। তাকে দেখাচ্ছে ইন্দ্রাণীর মতো। লীলা বলল, আমার গায়ের সব গয়না হলো আমার মার। বিশেষ বিশেষ দিনে আমি আমার মায়ের গয়না পরে বসে থাকি।

মুহিব বলল, আমাকে আসতে বলেছেন কেন?

লীলা বলল, ধন্যবাদ দেবার জন্যে। গতকাল ধন্যবাদ দেয়া হয় নি। বসুন।

মুহিব বসল। লীলা বলল, বাবা বাসায় থাকলে ভালো হতো। বাবার সামনে ধন্যবাদ দিতে পারতাম। বাবার আজই একটা জরুরি কাজ পড়ে গেল।

লীলা হাতে একটা কাগজ নিয়ে পড়তে শুরু করল–

আমি এখনো আপনার নাম জানি না। আপনি আমার নাম জানেন। আপনি কিছুটা এগিয়ে আছেন। নর্দমায় পড়ে যাবার মতো হাস্যকর একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। আপনি আমাকে টেনে তুলেছেন। এটি চোরাবালি থেকে টেনে তোলার মতো বড় কোনো উদ্ধারকর্ম

না। তারপরেও যে স্বাভাবিকতার সঙ্গে কাজটি আপনি করেছেন তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনাকে লিখিতভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।

মুহিব বলল, আপনি তো বিরাট নাটক শুরু করেছেন।

লীলা বলল, নাটক এখনো শেষ হয় নি। এখন আমার মা যে কবিতার বইটা দিয়েছেন, সেখান থেকে একটা কবিতা পাঠ করে শোনানো হবে। আপনার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে না, কবিতা আপনার পছন্দের বিষয়। তারপরেও শুনতে হবে।

God once declared he was true
And then took the veil and withdrew,
And remember how final a hush
Then descended of old on the bush.

লীলা বলল, কিছু বুঝতে পারলেন।

মুহিব বলল, না।

লীলা বলল, বুঝতে না পারলে লজ্জিত বোধ করার কিছু নেই। এই কবিতাটা খুব সহজভাবে লেখা অত্যন্ত কঠিন একটা কবিতা। এখন বলুন, আপনার নাম কী?

মুহিব।

আপনার মোবাইল টেলিফোনের নাম্বারটা আমাকে দিন। টেলিফোনে আরো একদিন আসতে বলব, বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে।

আমার কোনো মোবাইল টেলিফোন নেই।

নেই কেন? মোবাইল ব্যবহার পছন্দ করেন না বলে নেই, না-কি টাকা নেই বলে নেই?

মুহিব বলল, টাকা নেই বলে নেই।

লীলা তার সেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, রেখে দিন, এটা আপনার। আমি আরেকটা কিনে নেব। নিতে বলছি নিন। আর শুনুন, আমি ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী। ইংরেজিতে আপনি, তুই নেই। সবাই তুমি। এখন থেকে আপনাকে আমি তুমি করে বলব। আপনিও আমাকে তুমি বলতে পারেন। তুমি বলতে অস্বস্তি বোধ করলে আপনি বলতে পারেন।

মুহিব বলল, আমি এখন উঠি?

লীলা বলল, না। তুমি দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে। আমি রান্না করেছি। আমি রাঁধতে পারি না। ডিমভাজি করেছি আর ডাল। বুয়া কৈ মাছ রান্না করেছে। আমি চাই আমার রান্না আজ খাবে। বাথরুমে যাও, হাতমুখ ধুয়ে আস। ঐদিকে বাথরুম।

মুহিব দ্রুত বাথরুমে ঢুকে গেল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। বাথরুমে ঢুকে পড়ায় লীলা নামের অদ্ভুত মেয়েটা মুহিবের দুর্বলতা ধরতে পারল না।

বৃষ্টি এখনো পুরোপুরি কমে নি। তবে আগের মতো পড়ছে না। টিপটিপ করে পড়ছে। মুহিব বের হয়ে পড়ল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, এই বৃষ্টি আজ সারাদিনেও কমবে না। চায়ের দোকানে বন্দি হয়ে থাকার কিছু নেই।

সামান্য এগুতেই বড় বড় ছাতা হাতে কিছু লোকজনকে দেখা গেল। অতি ব্যস্ত ভঙ্গিতে তারা ছোটাছুটি করছে। মুহিব এগিয়ে গেল। বেকার মানুষদের কৌতূহল বেশি থাকে। কৌতূহল মেটানোর অবসরও তাদের আছে।

নাটকের শুটিং হচ্ছে। সব রেডি করা আছে। বৃষ্টি পুরোপুরি থামলেই শুটিং শুরু হবে। নায়িকা প্লাস্টিকের লাল চেয়ারে বসা। তার মাথার ওপর সী বিচের প্রকাণ্ড ছাতা ধা। সেই ছাতার রঙও লাল। ছাতা এমনভাবে ধরা যেন নায়িকার মুখ দেখা না যায়। মুহিব ছাতা হাতে নিয়ে ছোটাছুটি করছে এমন একজনকে বলল, ভাই নাটকের নাম কী?

নাটকের লোকজন দর্শকদের কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না। এই লোক দিল। ভদ্রভাবে বলল, এই বসন্তে। ভ্যালেনটাইন দিবসের নাটক।

মুহিব বলল, নামটা সুন্দর। ডিরেক্টর কে?

আমিই ডিরেক্টর।

মুহিব বলল, স্যার সরি।

সরি কেন?

মুহিব বলল, আপনাকে সাধারণ কেউ ভেবেছিলাম, এইজন্যে সরি বলেছি।

আমি সাধারণ। অসাধারণ কিছু না। একটা শট দেবেন?

মুহিব বলল, বুঝতে পারলাম না কী বললেন?

আমাদের একজন আর্টিস্ট আসে নি। তার মুখে একটা সংলাপ আছে। আপনি দিতে পারবেন?

মুহিব তাকিয়ে রইল। কী বলবে বুঝতে পারছে না। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, নাটকের নায়িকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছছে। আপনি একজন পথচারী। মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে এগিয়ে যাবেন। এবং বলবেন, ম্যাডাম, কী হয়েছে?

মুহিব বলল, রাস্তায় কোনো অপরিচিত মেয়েকে কাঁদতে দেখলে আমরা ম্যাডাম বলি না। আমরা শুধু বলি— কী হয়েছে?

ঠিক আছে আপনি কী হয়েছে বলবেন। তখন মেয়েটি বলবে— Get lost. তারপরেও আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। তখন মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলবে— Get lost-এর মানে বোঝেন না? যান ফুটেন। আপনি চলে আসবেন। পারবেন?

জি স্যার পারব।

গুড। ক্যামেরার দিকে ভুলেও তাকাবেন না। ক্যামেরার দিকে তাকালে শট NG হয়ে যাবে।

NG টা কী?

NG হচ্ছে Not Good, অর্থাৎ শট নষ্ট। আবার নতুন করে নিতে হবে। পারবেন তো?

স্যার চেষ্টা করব।

তাহলে আসুন। বৃষ্টি থেমে গেছে। এখনি শট হবে।

মুহিব ঠিকঠাক মতো করল। নায়িকার মুখে Get lost শুনে আহত দৃষ্টিতে তাকালো। নায়িকা যখন বলল, ফুটেন তখন আরো লজ্জা পেল। চলে যাবার সময় এক পলকের জন্যে দাঁড়িয়ে আরেকবার তাকালো নায়িকার দিকে।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আপনার টেলিফোন নাম্বার দিয়ে যান। ছোটখাটো কোনো রোল থাকলে আপনাকে ডাকব। আপনি ক্যামেরা ফ্রি। চা খান।

শুধু চা না, তাকে চায়ের সঙ্গে দুটা সিঙ্গাড়া দেয়া হলো। সিঙ্গাড়া খাবার সময় নায়িকা এসে সামনে দাড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, আপনার অভিনয় ভালো হয়েছে। এটা প্রথম কাজ?

জি।

নাম কী?

মুহিব।

আপনার টেলিফোন নাম্বার এবং নাম একটা কাগজে লিখে আমাকে দিন। আমি চেষ্টা করব আপনাকে ভালো একটা সুযোগ দিতে।

ম্যডাম থ্যাংক য়্যু।

আপনি কি আমার নাটক বা সিনেমা দেখেছেন?

জি ম্যাডাম, অনেক দেখেছি। (পুরোপুরি মিথ্যা কথা। তাদের বাসার টিভি থাকে বাবার শোবার ঘরে। মুহিবের টিভি দেখা হয় না। নায়িকাকে সে চিনতে পারে নি। তবে আজ যেহেতু বুধবার, মিথ্যা কথা বলা যায়।)

মিথ্যাদিবস শেষ হবার একঘণ্টা আগে রাত এগারোটায় মুহিবের জীবনে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। দুপুরের দেখা নায়িকা তাকে টেলিফোন করলেন।

আপনি মুহিব!

জি।

আমাকে চিনেছেন তো? দুপুরে আমার সঙ্গে কাজ করলেন।

জি ম্যাডাম। স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম।

আপনার জন্যে ভালো একটা খবর আছে। একটা নাটকে আপনাকে কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবার ব্যবস্থা করেছি।

থ্যাংক য়্যু ম্যাডাম।

ভালোমতো কাজ করবেন, আমার যেন বদনাম না হয়। আমি ডিরেক্টরকে বলেছি–আপনি একজন Born actor.

ম্যাডাম, আপনার দয়ার কথা সারাজীবন মনে থাকবে।

কান্নার শব্দ পাচ্ছি। কে কাঁদছে?

আমার ছোটবোন কাঁদছে। ভূত দেখে ভয় পেয়ে কাঁদছে। তার নাম অশ্রু। সে প্রায়ই ভূত দেখে।

আজও দেখেছে?

জি। মাথার চুল আঁচড়াচ্ছিল। হাত থেকে চিরুনি পড়ে গেল। সে চিরুনি তুলতে নিচু হয়েই দেখে, তার খাটের নিচে ভুতটা বসে আছে। ভূতটা তার মাথার চুল খপ করে ধরে ফেলল। অশ্রু অনেক চেষ্টা করল চুল ছাড়াতে পারল না। তার মাথার একগোছা চুল ভূতটা টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে।

এই ঘটনা কি সত্যি ঘটেছে, না আপনি বানাচ্ছেন?

সত্যি ঘটেছে ম্যাডাম।

আপনার বোন কত বড়?

এগজাক্ট বয়স বলতে পারব না। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে। কোচিং সেন্টারে কোচিং করছে।

আপনার বোনের নাম কী বললেন?

অশ্রু।

আমার ধারণী অশ্রু সিজিয়োফ্রেনিক। ওর চিকিৎসা করাতে হবে। আমি একজন ডাক্তারের ঠিকানা দেব। তার কাছে নিয়ে যাবেন। আমি ব্যবস্থা করে দেব যেন ভিজিট না নেয়।

ম্যাডাম, থ্যাংক য়্যু।

যে নাটক করতে যাচ্ছেন তার নাম জানতে চাইলেন না?

নাম কী?

নামটা পয়েটিক–দিঘির জলে কার ছায়া গো।

২. টেলিফোনে লীলা কাউকে হ্যালো বলে না

টেলিফোনে লীলা কাউকে হ্যালো বলে না। বান্ধবীদের বলে, আমি সমুচাঁ। মুহিবকে বলে, আমি লী। অপরিচিতদের বলে, লীলা কথা বলছি।

লীলা টেলিফোন করেছে মুহিবকে। যথারীতি বলল, আমি লী। ওপাশ থেকে হেড়ে গলায় কে একজন বলল, কারে চান?

লীলা বলল, এটা মুহিবের ফোন না?

ওপাশ থেকে বলল, হইতে পারে। আমি স্যারের নাম জানি না।

আপনার স্যার কে?

হিরু।

হিরু মানে? তার নাম হিরু?

নাটকের হিরু। স্যার এহন পার্ট গায়। পরে করেন।

আপনি কে?

আমার নাম ছামছু। প্রডাকশনে কাম করি। আফা, অহন রাখি। হিরুইন আমারে বুলায়!

আধঘণ্টা পর লীলা আবার টেলিফোন করল। সেই হেঁড়ে গলা। লীলা বলল, আপনি ছামছু?

জে।

আপনার স্যার কী করে?

হিরুইনের সাথে নাশতা খায়।

কী নাশতা?

এক পিস কেইক, সিঙাড়া আর কলা।

আপনার স্যারকে কি এখন টেলিফোন দেয়া যাবে?

ধরেন দিতাছি।

টেলিফোনে মুহিবের গলা পাওয়া গেল। লীলা বলল, কী করছ তুমি?

মুহিব বলল, নাটক করছি। চ্যানেল আই-এ ভ্যালেনটাইন ডে-তে দেখাবে।

তুমি অভিনয় কর জানতাম না তো!

মুহিব হাসতে হাসতে বলল, আমি নিজেও জানতাম না। পাকেচক্রে হয়ে গেল। কীভাবে হয়ে গেল পরে বলব।

কিসের অভিনয় করছ?

আমি একজন পেইন্টার। আমার সঙ্গে হঠাৎ একটা মেয়ের পরিচয় হয়েছে। এই নিয়ে গল্প। মেয়েটি অন্ধ।

কোথায় শুটিং হচ্ছে বলো তো? আমি আসছি। শুটিং দেখব। আমি জীবনে কখনো শুটিং দেখি নি।

অসম্ভব। তোমার সামনে আমি কিছুই পারব না।

তোমার অভিনয় কেমন হচ্ছে?

মনে হয় ভালো। ডিরেক্টর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, আমি মঞ্চকর্মী কি-না। এই থেকে মনে হলো ভালো হচ্ছে। লীলা, আমাকে ডাকছে। পরে কথা বলব। মনে হয় শট দিতে হবে।

শট দিতে হবে মানে কী?

একটা সিকোয়েন্স হবে। সিকোয়েন্সকেই এরা শট বলে। আমি ঠিক জানিও। লীলা রাখি?

ডিরেক্টর সাহেব সিকোয়েন্স বুঝিয়ে দিলেন। অন্ধ মেয়েটিকে আপনি রাস্তা পার করে দেবার জন্যে হাত ধরেছেন। মেয়েটি বলল, হাত ধরেছেন কেন?

আপনি বলবেন, রাস্তা পার করার জন্যে।

মেয়েটি বলবে, হাত ছাড়ুন, আমি নিজে নিজে রাস্তা পার হতে পারি।

এই বলে হাত ছাড়িয়ে সে নিজে নিজে রাস্তা পার হতে যাচ্ছে, তখন দেখা গেল দ্রুতগতিতে একটা ট্রাক আসছে। আপনি ভয়ে অস্থির হয়ে একবার ট্রাকের দিকে তাকাচ্ছেন, আরেকবার মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি কাট না বলা পর্যন্ত অভিনয় ধরে রাখবেন। অভিনয় ছেড়ে দেবেন না।

মুহিব বলল, কী বললেন বুঝতে পারলাম না স্যার। অভিনয় ধরে রাখব মানে কী?

যারা নতুন তাদের প্রধান সমস্যা, নিজের ডায়লগ বলার পরই তারা। এক্সপ্রেশন ছেড়ে দেয়। এটা করবেন না। বুঝেছেন?

জি স্যার।

দৃশ্যটা খুবই ভালো হলো। ডিরেক্টর বললেন, এক্সেলেন্ট। শুধু এক্সেলেন্ট বললেও কম বলা হবে। এক্সেলেন্টের ওপরে। তোমরা আমাদের নতুন অভিনেতা মুহিবের জন্যে একটা ক্ল্যাপ দাও।

সবাই ক্ল্যাপ দিল। ডিরেক্টর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাতে ধরাতে মুহিবকে বললেন, সিগারেটের ব্যান্ড হেভিট কি আছে?

মুহিব জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করল। ডিরেক্টর প্রডাকশনের এক ছেলেকে (ছামছু না, অন্য আরেকজন) বললেন, মুহিবকে এক প্যাকেট সিগারেট দাও।

প্রডাকশনের ছেলে সিগারেট দিতে দিতে ফিসফিস করে বলল, ডিরেক্টর সারি আপনেরে ভালো পাইছেন। আপনার কপাল খুলল। চা খাবেন? চা দিব?

দাও।

হিরুইন আপনারে ডাকে। ঐ দেহেন, ইশারা করতেছে।

মুহিব সিগারেটের প্যাকেট হাতে এগিয়ে গেল। হিরোইনের নাম নিলি। তার গায়ের রঙ শ্যামলা। এই রঙেই তাকে সুন্দর লাগছে। মনে হচ্ছে ফর্সা রঙ তাকে মানাত না। তার বয়স পঁচিশের ওপরে, কিন্তু দেখাচ্ছে সতেরো-আঠারো বছরের তরুণীর মতো।

নিলির মাথার ওপর প্রডাকশনের একটা ছেলে প্রকাণ্ড ছাতা ধরে আছে। নিলি বসে আছে ছায়ায়। তার পাশে একটা খালি চেয়ার আছে। মুহিব সেখানে বসল না। নিলি বলল, দূরে বসেছেন কেন? ছায়ায় এসে বসুন।

মুহিব বলল, আমি একটা সিগারেট ধরবি এইজন্যে দূরে বসেছি।

নিলি বলল, তাহলে ঠিক আছে। আমি সব সহ্য করতে পারি, দুটা জিনিস সহ্য করতে পারি না। সিগারেটের ধোয়ার গন্ধ আর কানের কাছে মশার ভনভন শব্দ। আমার এমনই কপাল, এই দুইয়ের অত্যাচার আমাকে সহ্য করতে হয়। ধরুন একটা ঘরে আমি আছি,

আরো দুজন আছে। ঘরে যদি মশা থাকে, সেই মশা ঐ দুজনের কাছে যাবে না। আমার কানের কাছে এসে শুনন করতে থাকবে। আর ঐ দুজন যদি সিগারেট ধরায়, তাদের ধোয়া অন্য কোনো দিকে যাবে না। আসবে আমার কাছে। আপনি সিগারেট ধরাচ্ছেন না কেন?

মুহিব বলল, থাক, আপনার সামনে ধরাব না।

নিলি বলল, ধরান তো। আমি এখুনি প্রমাণ করব যে ধোয়া আমার দিকে আসবে।

মুহিব সিগারেট ধরাল। ধোয়া সত্যি সত্যি নিলির দিকে যাচ্ছে। নিলি খিলখিল করে হেসে ফেলল। মুহিব মনে মনে স্বীকার করল, এত সুন্দর হাসির শব্দ সে আগে কখনো শোনে নি। বেশিরভাগ রূপবতী মেয়ে নকল হাসি হাসে। হাসার সময় ঢং করার চেষ্টা করে। তাদের হাসি হায়নার হাসির মতো হয়ে যায়। মুহিবের ধারণা, প্রতিটি তরুণী মেয়ের হাসির শব্দ রেকর্ড করে তাকে শোনানো উচিত। এতে যদি কিছু হয়।

মুহিব, আপনার বোন কেমন আছে?

ভালো আছে ম্যাডাম।

অশ্রু নাম, তাই না?

জি।

তাকে ডাক্তারের কাছে কবে নিয়ে যাবেন?

এখনো ঠিক করি নাই।

আজ তো সন্ধ্যার আগেই শুটিং শেষ হবে। আজই নিয়ে যান। আমি ডাক্তারের সঙ্গে আপয়েন্টমেন্ট করে দেই। দেব?

জি আচ্ছা।

নিলি হ্যান্ডব্যাগ খুলে টেলিফোন বের করল। অনেক সময় নিয়ে এসএমএস টাইপ করে পাঠিয়ে দিল। টেলিফোন ব্যাগে রাখতে রাখতে বলল, আটটার আগে চলে যাবেন। গ্রীনরোড়ে তার চেম্বার। ৩৮ গ্রীনরেড়ি। চেম্বারে সাইনবোর্ড আছে–নিরাময়। ডাক্তার সাহেবের নাম খালেক। মনে থাকবে?

থাকবে।

আমার অন্ধের অভিনয় কেমন হয়েছে?

ভালো হয়েছে।

দর্শক যখন দেখবে তখন কি তাদের মনে হবে এই মেয়েটা সত্যি অন্ধ?

মুহিব বলল, মনে হবে না।

নিলি বলল, কেন মনে হবে না?

কারণ আপনি বিখ্যাত অভিনেত্রী। সবাই আপনাকে চেনে। আপনি যাই করেন সবাই ধরে নেবে অভিনয় করছেন। তবে যারা আপনাকে চেনে না, তারা অন্ধ মেয়ে ভাববে। অবশ্যই ভাববে।

এত জোর দিয়ে অবশ্যই কেন বলছেন? আমাকে খুশি করার জন্যে?

জি-না ম্যাডাম। আমি হিমু গ্রুপের মানুষ। হিমু গ্রুপের মানুষ কাউকে খুশি করার জন্যে কিছু করে না।

নিলি বলল, হিমুর ব্যাপারটা আমি জানি। উপন্যাসের একটা চরিত্র। একে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার কিছু নেই।

ম্যাডাম, মানুষের নিয়ম হচ্ছে, গুরুত্বহীন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া। আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি পাশ কাটিয়ে যাওয়া।

নিলি বলল, হতে পারে। আপনার সিগারেট শেষ হয়ে গেছে, আরেকটা ধরান তো।

মুহিব অবাক হয়ে বলল, আরেকটা ধরাব?

হুঁ। আরেকটা।

কেন?

নিলি বলল, আমি বিরক্ত হতে পছন্দ করি। আপনি আরেকটা সিগারেট ধরাবেন, তার ধোয়া আমার দিকে আসবে, আমি বিরক্ত হব। মজা না? নিলি আবারো খিলখিল করে হাসছে। হাসতে হাসতেই সে উঠে গেল। ডিরেক্টর সাহেব হাতের ইশারায় ডাকছেন। শট বুঝিয়ে দেবেন।

ডাক্তার খালেকের চেম্বারে মুহিব বোনকে নিয়ে বসে আছে। বেচারি ভয়ে অস্থির।

সে দুবার ফিসফিস করে বলল, ভাইয়া, ভয় লাগছে।

ডাক্তার খালেকের শরীর ভারি। গলার স্বর ভারি। চশমার কাচ ভারি। তিনি তার বেয়ারাকে কঠিন কঠিন কথা নিচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলছেন। বেয়ারার হাতে চায়ের কাপ। হাত কাঁপছে বলে কাপ এবং পিরিচে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। যে-কোনো মুহুর্তে পিরিচ থেকে কাপ পড়ে যাবে এমন অবস্থা।

করিম, তুমি যে ভুল করেছ সেই ভুল কি আর হবে?

হবে না স্যার।

একই উত্তর গতমাসে একবার দিয়েছ, বলেছ ভুল আর হবে না। বলেছিলে?

জি স্যার।

তার আগের মাসে একবার বলেছিলে, আর ভুল হবে না। বলেছিলে যে মনে আছে?

মনে আছে।

দানে দানে তিনদান। তিনদান হয়ে গেছে। এখন বিদায়! ক্লিনিকের ম্যানেজারের কাছ থেকে বেতন নিয়ে ভ্যানিস হয়ে যাও। ভ্যানিস বুঝ? ভ্যানিস মানে হাওয়া। আর যেন তোমাকে দেখতে না পাই।

জি আচ্ছা সার।

ভ্যানিস হবার আগে আমাদের তিনজনকে তিনটা লেবু চা দিয়ে যাও। চা ভালো হলে আবার চাকরিতে বহাল হবার ক্ষীণ সম্ভাবনা আছে।

করিম প্রায় ছুটে বের হয়ে গেল। এই অবস্থাতেও তার হাতে ধরা পিরিচ থেকে চায়ের কাপ পড়ল না। ডাঃ খালেক মুহিবের দিকে ফিরে বললেন, আপনার নাম মুহিব?

মুহিব বলল, জি স্যার।

আর এই মেয়েটির নাম অশ্রু। এই অশ্রুই কি খাটের নিচে ভূত দেখে? কি মা, তুমি ভূত দেখ?

অশ্রু হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

ডাঃ খালেক বললেন, নিলি টেলিফোনে আমাকে বিস্তারিত জানিয়েছে। ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। নিলি আছে কেমন?

মুহিব বলল, ম্যাডাম ভালো আছেন।

অভিনয় করে বেড়াচ্ছে?

জি স্যার।

ডাঃ খালেক অশ্রুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন তোমার সঙ্গে কথাবার্তা। মা, বলো তুমি কি খুব ধর্মকর্ম কর?

মুহিব প্রশ্নের উত্তরে না বলতে যাচ্ছিল, তাকে চমকে দিয়ে অশ্রু বলল, জি স্যার।

পাঁচ ওয়াক্ত রেগুলার নামাজ ছাড়া আর কী পড়? তাহাজ্জুতের নামাজ পড়?

জি।

চাশতের নামাজ? সকাল এগারোটার দিকে পড়া হয়।

পড়তে চেষ্টা করি। যেদিন কোচিং খাকে সেদিন পড়তে পারি না।

ডাঃ খালেক বললেন, সিজিয়োফ্রেনিক রোগীদের অনেক লক্ষণের মধ্যে একটা হচ্ছে তারা হঠাৎ প্রবল উৎসাহে এবং আবেগে ধর্মকর্ম শুরু করে। নামাজ, রোজা, তসবি জপ।

মুহিব বলল, ও যে ধর্মকর্ম করে আমি জানতাম না স্যার। আমি কখনো দেখি নি।

ডাঃ খালেক বললেন, দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে এখন দেখি বেশির ভাগ পারিবারিক বন্ধন আলগী। পরিবারের এক সদস্য কী করছে অন্যরা তার খোঁজ রাখছে না। ছেলে ড্রাগ ধরেছে, বাবা-মা কিছুই জানে না। ভেরি স্যাড।

মুহিব বলল, জি স্যার।

ডাঃ খালেক হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, করিমকে চা দিতে বলেছি প্রায় আট মিনিট আগে। এখনো চা আসে নি।

মুহিব বলল, আপনার কথাবার্তায় সে খুব ভয় পাচ্ছিল তো, এইজন্যে ভুলে গেছে। প্রচণ্ড ভয় পেলে স্মৃতি এলোমেলো হয়। বাবা যখন আমাকে ধমকান, আমারও এরকম হয়। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, যা পাঁচটা সিগারেট নিয়ে আয়। আমি বাবার সামনে থেকে বের হই, সিগারেটের কথা ভুলে যাই।

ডাঃ খালেক অশ্রুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমিও কি তোমার ভাইয়ের মতো বাবাকে ভয় পাও?

অশ্রু বলল, পাই স্যার।

তোমার বাবা কি তোমার খাটের নিচের ভূতের কথা জানেন?

জানেন।

উনি এই বিষয়ে কী বলছেন?

অশ্রু বলল, বাবা বলেছেন ভূত থাকবে ভূতের মতো, তুই থাকবি তোর মতো। সমস্যা কী?

ডাঃ খালেক বললেন, আমি তোমাকে বেশ কিছু ওষুধ দিচ্ছি। নিয়মমতো খেতে হবে। ভুল করা যাবে না। দশদিন পর আবার আসবে। এই দশদিনে কতবার ভূত দেখলে, ভূতটা কী করল, সব খাতায় লিখবে। তারিখ এবং সময়ও লেখা থাকবে। হাতের কাছে একটা খাতা নিয়ে ঘুমুতে যাবে। রাতে কোনো স্বপ্ন দেখে যদি ঘুম ভাঙে, সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নটা লিখে ফেলবে। স্বপ্ন হচ্ছে Short time memory. রাতের স্বপ্ন দিনে মনে থাকে না। এইজন্যেই রাতেরটা রাতে লিখে ফেলতে হয়। কী বললাম মনে থাকবে?

জি স্যার।

রাতে কি একা ঘুমাও।

জি।

একা ঘুমুবে না। কেউ-না-কেউ যেন রাতে তোমার সঙ্গে থাকে।

জি আচ্ছা।

মুহিব ভিজিট দিতে গেল। ডাঃ খালেক বললেন, নিলি আপনাকে পাঠিয়েছে, কাজেই ভিজিটের প্রশ্ন ওঠে না। নিলি আমার পেশেন্ট ছিল। তারও অশ্রুর মতো সমস্যা ছিল, তবে সে ভূত দেখত না। অচেনা এক লোককে তার ঘরে বসে থাকতে দেখত। যাই হোক বিদায়। দশদিন পর দেখা হবে।

মুহিব উঠে দাঁড়াল, আর তখনি করিম ট্রে নিয়ে ঢুকল। ট্রেতে চা আছে, নোনতা বিসকিষ্ট আছে। তিন গ্লাস পানি আছে।

ডাঃ খালেক করিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, চা নিয়ে বি সুপিড়। তোর চা এখন কে খাবে?

চেম্বার থেকে বের হয়ে অশ্রু বলল, ডাক্তারটা পাগলা আছে, তাই না ভাইয়া?

মুহিব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, পাগলের ডাক্তাররাও খানিকটা পাগল হন।

উনি পাগলের ডাক্তার।

হুঁ।

আমি কি পাগল?

অবশ্যই পাগল। পাগল না হলে কেউ খাটের নিচে ভূত দেখে?

অশ্রু বলল, তুমি ভুলে গেছ, ভূতটা টান দিয়ে আমার মাথার এক গোছা চুল ছিঁড়ে ফেলেছিল।

মুহিব বলল, তুই নিজের চুল নিজে ছিঁড়েছিস। ভূতের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস।

নিজের মাথার চুল আমি নিজে কেন ছিঁড়ব?

পাগল বলেই ছিঁড়বি। যাই হোক, ওষুধ কিনে দিচ্ছি। ঠিকমতো ওষুধ খেয়ে ভালো হয়ে যা।

ওষুধ যে কিনবে টাকা আছে?

আছে।

কোথায় পেয়েছ?

মুহিব জবাব দিল না। নাটকের শুটিং-এ দিনের টাকা দিনে দিয়ে দেয়। মুহিব চার হাজার টাকা পেয়েছে। ঢাক বাজিয়ে এই তথ্য জানাবার কিছু নেই।

রাস্তার ওপাশেই একটা ফার্মেসি দেখা যাচ্ছে। সে যাচ্ছে ফার্মেসির দিকে। অশ্রু তার পেছনে পেছনে যাচ্ছে। অশ্রুকে কেন জানি খুব আনন্দিত বলে মনে হচ্ছে।

ভাইয়া, ওষুধ কেনার পরেও কি তোমার কাছে টাকা থাকবে?

থাকতে পারে। এক জায়গা থেকে চার হাজার টাকা পেয়েছি।

যদি টাকা থাকে আমাকে একটা জিনিস কিনে দিবে?

কী জিনিস?

একটা বোরকা। বাইরে যখন যাই, পুরুষমানুষগুলা কেমন করে যেন তাকায়। এত বিশ্রী লাগে!

বোরকা কেনার মধ্যে আমি নাই।

প্লিজ ভাইয়া। প্লিজ।

মুহিব বিরক্ত মুখে নয়শ টাকা দিয়ে একটা বোরকা কিনল।

ভাইবোন বাসায় ফিরল রাত নটায়।

উঠানে বেতের চেয়ারে আলাউদ্দিন বসে আছেন। বারান্দায় বাতি জ্বালানো। বাতির আলোয় তার থমথমে মুখ দেখা যাচ্ছে। ছেলেমেয়েকে ঢুকতে দেখে তার মুখের চামড়া শক্ত হয়ে গেল। তিনি ছেলেকে কিছু জিজ্ঞেস না করে অশ্রুকে বললেন, কোথায় গিয়েছিলি? সত্যি কথা বলবি সত্যি কথা বললে ক্ষমা পারি। মিথ্যা বললো বটি দিয়ে গলা ফাঁক করে ফেলব।বল। কোথায় গিয়েছিলি?

অশ্রুঘলল, ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম বাবা।

আলাউদ্দিন বললেন, টাং টাং ঘরে ঘুরছি আর মুখে বলছিস ভাক্তারের কাছে গিয়েছি। ফার্স্ট শো সিনেমা দেখে এসেছিস। সত্যি কথা বলা সত্যি কথা বললে ক্ষমা। সিনেমা দেখে এসেছিস।

অশ্রু বলল জি বাবা।

কোন হলে ছবি দেখেছিস বলাকা?

অশ্রুবলল, জি বাবা।

ছবির নাম কী?

অশ্রু হতাশাচোখেমুহিবের দিকে তাকালে আজ মিথ্যাদিবস বাধ্য হয়ে বোনের কারণে মুহিবকে বলতে হলো ছবির নাম, বাবা কেন আসামি।

আলাউদ্দীন অশ্রুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ছবির নামা বাবা কেন আসামি?

অশ্রুর গলা পর্যন্ত কান্না চলে আসছে।অনেক কষ্টে কান্না আটকেবলল, জি বাবা।

ঠিক আছে, সামনে থেকে যাও। হাত-মুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়া করে আমাকে বাধিত কর।

খাবার সময়ও আলাউদ্দিন অনেক ঝামেলা করলেন। ডিমের তরকারিতে লবণ। বেশি হয়েছে এই নিয়ে ঝামেলা। তিনি কঠিন গলায় কালেন, চিনি বেশি হলে খাওয়া যায়। লবণ বেশি হলে খাওয়া যায় না অশ্রুর মা, তুমি কি এই কথাটা জানো?

রাজিয়া জড়সড় হয়ে রইলেন। জবাব দিলেন না।

এত বছরেও যার লবণের আন্দাজ হয় নাই, তাকে কীশাস্তি দেয়া উচিত সেটা জানো? জবার দাও, জানো?

রাজিয়া ক্ষীণ গলায় বললেন, জানি না।

আলাউদ্দিন ঠান্ডা গলায় বললেন, কী করা উচিত। রাজিয়া বেগম আতঙ্কিত গলায়। এদিক-ওদিক তাকালেন। ছেলেমেয়ে কাউকেই আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না। এই ভয়ঙ্কর কুৎসিত কথা কেউ শোনে নি। কিংবা কে জানে ঘরে বসে হয়তো শুনেছে। তাঁর চোখে পানি এসে গিয়েছিল তিনি সাবধানে। চোখের পানি মুছলেন।

মুহিব অশ্রুর ঘরে খাটের ওপর বসে ছিল। অশ্রু বলল, বাবা কী কথা বলেছে শুনেছ ভাইয়া?

মুহিব বলল, না। আমার কানে ফিল্টারের মতো আছে। যে সব কথা শুনতে চাই না, কান সেগুলি ফিল্টার করে বাইরে ফেলে দেয়।

তুমি সত্যি শুনতে পাও নি?

মুহিব জবাব দিল না। বাটি ভাঙার আওয়াজ আসছে। আলাউদ্দিন সম্ভবত গ্লাস বাটি ছুড়ে মারা শুরু করেছেন। রাগারাগির শেষ পর্যায়ে তিনি এই কাজ করেন।

অশ্রু বলল, ভাইয়া, রাতে আমার সঙ্গে কে ঘুমাবে?

মুহিব বলল, কেউ ঘুমাবে না। তুই একা ঘুমাবি।

ডাক্তার যে বলল একা না ঘুমাতে?

মুহিব বলল, ডাক্তার একা ঘুমাতে নিষেধ করেছেন, এদিকে আবার রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একা ঘুমাতে। ডাক্তার বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়?

রবীন্দ্রনাথ আবার কখন একা ঘুমাতে বললেন?

মুহিব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একলা চল একলা চল রে। চলার বেলায় একলা, আবার ঘুমুবার বেলায়ও একলা—

একলা ঘুমাও একলা ঘুমাও একলা ঘুমাও রে
যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা ঘুমাও রে...

অশ্রু বলল, ভাইয়া, তোমার গানের গলা তো খুবই সুন্দর।

মুহিব বলল, তাতে সমস্যা কী?

অশ্রু বলল, তুমি কোনো একটা গানের স্কুলে ভর্তি হয়ে গান শিখ তো ভাইয়া।

মুহিব সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, শুধু গান না। নাচও শিখব। দাড়িগোঁফ কামিয়ে ঠোটে লিপস্টিক দিয়ে খালি গায়ে হিজড়া নাচ দিব— এসো হে বৈশাখ।

অশ্রু হাসছে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসি বন্ধ করার চেষ্টা করছে, পারছে না।

রাজিয়া ঘরে ঢুকে বললেন, তোরা খাবি না?

মুহিব বলল, বাবার রাগ কমেছে?

হ্যাঁ। ভাত খেয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

মুহিব বলল, তোমার প্রবেশ নিষেধ?

হ্যাঁ।

মুহিব বলল, ভালোই হয়েছে, তুমি অশ্রুর সঙ্গে ঘুমাবে। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম— ডাক্তার বলেছেন রোগী যেন একা না শোয়।

রাজিয়া বললেন, রোগী মানে? অশ্রুর কী রোগ হয়েছে?

মুহিব বলল, অশ্রুর ভূতরোগ হয়েছে। খাটের নিচে যে ভূত দেখে এইটাই রোগ। মা, তাকে একটা বক্সখাট কিনে দিলে কেমন হয়! বখাটে খাটের নিচ বলে কিছু নেই, কাজেই ভূত বেচারার থাকার জায়গাও নেই। সে বাধ্য হয়ে বাবার খাটের নিচে আশ্রয় নেবে। মাঝরাতে বাবাকে ভয় দেখাবে।

রাজিয়া বললেন, খেতে আয় তো।

মুহিব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, মা, তুমি যে লটারিতে এক হাজার টাকা পেয়েছ এটা জানো?

না তো। আমি তো কোনো লটারির টিকিট কিনি নাই। মুহিব বলল, আমি তোমার হয়ে কিনেছি। সেখানে এক হাজার টাকা পাওয়া গেছে। এই নাও।

রাজিয়া টাকা হাতে নিতে নিতে আনন্দিত গলায় বললেন, কিসের লটারির টিকিট কিনেছিলি?

মুহিব বলে, ড্রামা লটারি। সেখানেই উঠেছে। তুমি বিরাট ভাগ্যবতী মা।

রাত একটা বাজে। মুহিবের চোখ ঘুমে ভেঙে আসছে। সে অনেক কষ্টে জেগে আছে। লীলা রাত একটায় টেলিফোন করবে। অল্প কিছুক্ষণ কথা বলে ঘুমুতে যাবে। এই নিয়ম।

মুহিবের টেলিফোন বাজছে। মুহিব ঘুমঘুম গলায় বলল, লীলা, কেমন আছ?

লীলা বলল, বৃষ্টি হচ্ছে জানো?

মুহিব বলল, জানি। আমাদের বাসার ছাদ টিনের। ছাদে শব্দ হচ্ছে।

আমি ঠিক করেছি ছাদে উঠে বৃষ্টিতে ভিজব।

মুহিব বলল, বৃষ্টিতে ভিজে নিওমোনিয়া বাধাও। কোনো অসুবিধা নেই।

লীলা বলল, কতক্ষণ তোমাকে দেখি না জানো?

কতক্ষণ?

চুয়ান্ন ঘণ্টা। কাল সন্ধ্যায় বাসায় আসতে পারবে?

পার্টি?

হ্যাঁ পার্টি।

হাইফাই ধরনের?

বলতে পার। পার্টি দিচ্ছেন আহসান সাহেব। উনি হাইফাই পার্টি পছন্দ করেন।

আহসান সাহেবটা কে?

তুমি যদি উত্তরমেরু হও উনি দক্ষিণমেরুরও দক্ষিণ। বৎসরে ছয় মাস আমেরিকা-ইউরোপ করেন। তাঁর একটা পিএইচডি ডিগ্রি আছে। টঙ্গীতে তার এটা ওষুধ ফ্যাক্টরি আছে। সাভারে আছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি।

তোমার সঙ্গে সম্পর্কটা কী?

লীলা বলল, আমার মা তাকে খুব পছন্দ করতেন। বাবাকে মৃত্যুর আগে বলে গেছেন তার সঙ্গে যেন আমার বিয়ে হয়।

সম্ভাবনা আছে?

অবশ্যই আছে। অপছন্দ করার মতো কিছু তাঁর মধ্যে নেই।

মুহিব হাই তুলতে তুলতে বলল, টেলিফোন রাখি। ঘুম পাচ্ছে।

লীলা বলল, আচ্ছা। তোমাদের ওদিকে কি এখনো বৃষ্টি হচ্ছে?

হুঁ।

হুঁ কী! সুন্দর করে বলল।

বৃষ্টি হচ্ছে। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে।

লীলা বলল, এক লাইন বৃষ্টির গান গেয়ে টেলিফোন রাখ।

মুহিব বলল, আমি ক্যাসেট প্লেয়ার না। টিপ দেবে আর গান বের হবে।

এক লাইন। প্লিজ, এক লাইন।

বৃষ্টির গান একটাও মনে পড়ছে না।

লীলা বলল, ঐটা গাও–এসো করো স্নান নবধারা জলে– এসো নীপ বনে। গানটা মাথার মধ্যে নিয়ে আমি বৃষ্টিতে ভিজব। প্লিজ প্লিজ প্লিজ। তিনবার প্লিজ বললে কথা শুনতে হয়। না শুনলে কী হয় জানো?

কী হয়?

তিনদিক থেকে বিপদ আসে।

মুহিব বলল, এখন গান শুরু করলে আমার ঘুম কেটে যাবে।

লীলা বলল, ঘুম কাটলে খুব ভালো হবে। তুমিও বৃষ্টিতে ভিজবে। একই সময় একই কাজ দুজন দুদিকে করব।

মুহিব হতাশ গলায় বলল, আমার ঘুম কেটে গেছে। সারারাত আমার আর ঘুম হবে না।

ঘুমের ওষুধ খেলেও হবে না?

না। এটা আমার অনেক দিনের সমস্যা, ঘুম কাটলে ঘুম শেষ।

তাহলে গল্প কর। তোমার নাটকটা কবে দেখাবে?

জানি না।

অন্ধ সেজেছে যে মেয়েটি তার নাম কী?

নিলি।

উনি তো বিখ্যাত অভিনেত্রী।

জানি না তো।

আমাদের ইউনিভার্সিটির একটা অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। এক্স স্টুডেন্ট হিসেবে। তিনি ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স করেছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি অভিনয় করেন কী জন্যে? তিনি বললেন, অভিনয় হচ্ছে অন্য মানুষ সাজা। এক অর্থে মানুষকে ভেঙ্গানো। মানুষকে ভেঙ্গাতে আমার ভালো লাগে। এই জন্যেই অভিনয় করি। মজার আনসার না?

খুব মজার না। যারা শো বিজনেসে থাকেন, তাদের মজার মজার কথা বলতে হয়।

লীলা বলল, তুমিও তো এখন শো বিজনেসে ঢুকে পড়েছ। তুমি একটা মজার কথা বলো। আচ্ছা আমি প্রশ্ন করছি–মুহিব সাহেব, আপনি অভিনয় করেন কেন?

হঠাৎ কিছু টাকা পাচ্ছি এই কারণে অভিনয় করি।

আপনার জীবনের প্রথম অভিনয় নিয়ে মজার কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

না নেই। সব অভিজ্ঞতাই টেনশনের।

ঠিক আছে। একটা টেনশনের অভিজ্ঞতাই বলুন।

মুহিব বলল, একটা দৃশ্য ছিল এরকম— অন্ধ মেয়েটি দিঘির পারে বসে আছে। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। আমি যে তার পাশে বসেছি এটা সে বুঝতে পারল না। আমি তখন তার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে কাশলাম।

এই দৃশ্যে টেনশনের কী আছে?

টেনশনের ব্যাপার হচ্ছে, দৃশ্যটা আমার পছন্দ হচ্ছিল না। কাশি বান্ধবীর দৃষ্টি আকর্ষণ কেন করব? আমি তখন ডিরেক্টর সাহেবকে বললাম, কাশি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ না করে আমি যদি নিচু গলায় এক লাইন গান করি–আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেক দিনের পরে– তাহলে কেমন হয় স্যার? আমি গান গাইতে পারি। ডিরেক্টর স্যার বললেন, খুবই ভালো হয়। ম্যাডাম নিলি বললেন, মোটেই ভালো হয় না। পুরো ব্যাপারটা সিনেমেটিক হয়। সস্তা বাংলা সিনেমা। দুজনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল। এক পর্যায়ে ম্যাডাম কঠিন গলায় বললেন, আমি এই নাটকে কাজ করব না। আমি চলে যাচ্ছি, আপনি অনা কোনো নায়িকা খুঁজে বের করুন।

উনি চলে গেলেন?

হ্যাঁ চলে গেলেন। আমার জন্যে পুরো ব্যাপারটা কেঁচে গেল। আগামীকাল শুটিং ছিল। শুটিং ক্যানসেল হয়ে গেছে।

লীলা বলল, তুমি সমস্যা বাঁধিয়েছ, তোমার উচিত সমস্যা মেটানো।

কীভাবে মেটাব?

যে সমস্যা তৈরি করে সে জানে কীভাবে সমস্যা মিটাবে। এই অনেক কথা বলে ফেলেছি— আমার নিজেরই এখন ঘুম পাচ্ছে। গুড নাইট।

বৃষ্টিতে ভিজবে না?

অবশ্যই ভিজব। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘুমাব। তুমি কখনো বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘুমিয়েছ?

না।

একটা পাটি পেতে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। টাওয়েল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হবে। মুখে বৃষ্টি পড়লে ঘুম আসবে না। মনে হবে মশা কামড়াচ্ছে।

লীলা টেলিফোন রেখে দিল।

৩. রাতে বৃষ্টিতে ভিজে

রাতে বৃষ্টিতে ভিজে লীলার ভালো ঝামেলা হয়েছে। শেষরাতে জ্বর এসেছে। শুরু হয়েছে ভাঙা ভাঙা স্বপ্ন। একটা শেষ হওয়া মাত্র আরেকটা। মাঝে মাঝে পানির পিপাসায় ঘুম ভাঙছে। খাটের পাশের সাইড টেবিলে পানির বোতল থাকে। বোতলে পানি নেই। ফ্রিজ থেকে পানির বোতল আনার প্রশ্নই আসে না। যতবার ঘুম ভেঙেছে ততবারই লীলা ক্লান্ত গলায় বলছে, কেউ কি আমাকে ঠান্ডা এক গ্লাস পানি খাওয়াবে? বলার জন্যে বলা। ঘরে সে এবং তার বাবা ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নেই। শওকত সাহেবের ঘর সর্বক্ষিণে। তিনি দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘুমান। চিল্কার করে ডাকলেও তার কানে যাবে না। কে তার জন্যে পানি নিয়ে আসবে? তবে জাগ্রত অবস্থায় পানি চাওয়ার একটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে। স্বপ্নে তার জন্যে পানি আসছে। প্রতিবারই সাত-আট বছরের একটি বালক পানি নিয়ে আসছে। বিশাল সাইজের গ্লাসভর্তি পানি। সে পানি এনে বলছে, মা, পানি এনেছি। লীলা হাতে পানির গ্লাস নিচ্ছে, কিন্তু গ্লাসে মুখ দেবার আগেই ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। স্বপ্নের বাচ্চাটা তাকে মা ডাকছে কেন কে জানে? তার অবচেতন মন কি চাইছে তার বিয়ে হোক? একটা বাচ্চা হোক। বাচ্চা তাকে মা ডাকুক?

সকাল আটটা। লীলা চাদরের নিচে। সে বুঝতে পারছে না। তার কি ঘুম ভেঙেছে, না-কি স্বপ্ন দেখছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ কানে আসছে। কে চালাবে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার? কাজেই এটা স্বপ্ন। রান্নাঘর থেকে কল ছাড়ার শব্দ আসছে। কেউ থালাবাসন ধুচ্ছে। অবশ্যই স্বপ্ন। লীলা চেষ্টা করল জেগে ওঠার। আর তখন তার ঘরের দরজা কেউ একজন সামান্য ফাক করে বলল, আপা, গুড মর্নিং!

বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে। সুশ্রী চেহারা। বড় বড় চোখ। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল। অ্যাপ্রন পরে আছে। লীলা বলল, কে?

ম্যাডাম, আমার নাম আসমা। আমি আপনাদের হাউসড়ে। আহসান স্যার আমাকে আর গনি মিয়াকে পাঠিয়েছে। আজ এই বাড়িতে উনার পার্টি আছে। আমরা গুছাচ্ছি। ম্যাডাম, চা-কফি কিছু খাবেন?

ঠান্ডা এক গ্লাস পানি খাব।

ম্যাডাম! আপনার কি শরীর খারাপ?

মনে হয় জ্বর এসেছে।

ম্যাডাম, আমি কি কপালে হাত দিয়ে জ্বর দেখব?

দেখ।

আসমা কপালে হাত দিয়ে বলল, অনেক জুর। ঘরে নিশ্চয় থার্মোমিটার আছে?

বাবার কাছে আছে।

ম্যাডাম, আমি পানি নিয়ে আসছি।

লীলা শুয়ে পড়ল। তার চোখ বন্ধ। জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পড়েছে, সেই রোদের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। চোখ কট কট করছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দটা মাথায় লাগছে। আসমা পানি নিয়ে এসেছে। ট্রে-তে পানির গ্লাস, টিস্যুবক্স, এককাপ চা এবং একটা থার্মোমিটার। লীলা অবাক হয়ে দেখল, আসমা মেয়েটির কাজকর্ম অত্যন্ত গোছানো। সে লীলার হাতে পানির গ্লাস দিল। পানি খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র তার হাতে দুটা টিস্যুপেপার দিল। কী জন্যে দিল লীলা বুঝতে পারল না। চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। পিরিচে দুটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট।

ম্যাডাম, প্যারাসিটামল খেয়ে চা খান। জ্বর সঙ্গে সঙ্গে কমবে। অনেকেই বলেন, খালি পেটে ওষুধ খাওয়া যায় না। কথাটা ঠিক না। অ্যাসপিরিন জাতীয় ট্যাবলেট খাওয়া যায় না। প্যারাসিটামল খাওয়া যায়। আগে থার্মোমিটারটা মুখে দিন, জ্বর দেখে দেই। টিপেপার দিয়ে থার্মোমিটারের মুখটা মুছে নিন।

হাতে টিস্যুপেপার দেবার রহস্য এখন ভেদ হলো। লীলা মুখে থার্মোমিটার দিয়ে বসে আছে। ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দ বন্ধ, এটা একটা স্বস্তির ব্যাপার। চেয়ার টানাটানির শব্দ হচ্ছে। এই শব্দ ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের শব্দের মতো অসহনীয় না।

ম্যাডাম! আপনার জ্বর একশ দুই পয়েন্ট পাঁচ। আপনি শুয়ে থাকুন।

লীলা বাধ্য মেয়ের মতো শুয়ে পড়ল। আসমা বলল, আহসান স্যার আমাকে বলে দিয়েছেন আপনার ঘুম ভাঙামাত্রই যেন তার সঙ্গে আপনাকে টেলিফোনে যোগাযোগ করিয়ে দেই। ম্যাডাম দেব?

না।

ম্যাডাম, উনি বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। এর মধ্যে দুবার টেলিফোন করেছেন। আপনার জ্বর স্যারকে আমি জানিয়েছি। সার খুবই চিন্তিত। স্যারকে ধরে দেই? শুধু হ্যালো বলুন। এতেই হবে।

দাও।

আসমা অ্যাপ্রনের পকেট থেকে মোবাইল টেলিফোন বের করল। নাম্বার টিপল এবং মোবাইল কানে দিয়ে বলল, স্যার, কথা বলুন। সে মোবাইল লীলার হাতে দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

লীলা! জ্বর না-কি বাঁধিয়েছ?

হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই তোমার অভ্যাস মতো কাল রাতে বৃষ্টিতে ভিজেছ। ঠিক না?

হ্যাঁ ঠিক।

কতক্ষণ ভিজেছ?

ঘড়ি দেখি নি, তবে অনেকক্ষণ ভিজেছি। বৃষ্টিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আজকের পার্টি অফ করে দেই?

দিন।

আমি কিন্তু আসব। রোগী দেখে যাব।

কখন আসবেন?

রাত আটটায়। তবে আমার ধারণা, তার আগেই তোমার জ্বর সেরে আঁবে। আসমা মেয়েটি তোমাকে সুস্থ করে তুলবে। এই মেয়ে খুব expert.

আসমা মেয়েটি সম্পর্কে বলুন। পার্টি গোছানোর জন্যে পাঠিয়েছেন?

পার্টি গোছানোর জন্যে গনি মিয়াকে পাঠিয়েছি। আর আসমা হলো আমার দিক থেকে তোমাকে উপহার। সংসার ঘড়ির কাটার মতো সচল রাখতে ওর মতো

একটি মেয়েই যথেষ্ট।

তাকে পেয়েছেন কোথায়?

সে দিনাজপুরের মেয়ে। ইন্টারমিডিয়েট পাশ। কুয়েতে এক আমীরের বাড়িতে হাউসমেড় ছিল। নানান ঝামেলায় পড়ে দেশে ফিরে আসে। তার অতীত ইতিহাসের তো তোমার দরকার নেই। না-কি আছে?

দরকার নেই।

তুমি রেস্ট নাও। জ্বর নিয়ে অতি প্রিয়জনদের সঙ্গেও কথা বলতে ভালো লাগে না। আর আমি অতি প্রিয়জনদের তালিকায় নেই।

লীলা বলল, আমার অতি প্রিয়দের তালিকায় কে কে আছে বলে আপনার ধারণী?

আহসান বলল, তোমার বাবা। মুহিব নামের যুবক, যে তোমাকে ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করেছে। তোমার ডাক্তার ছোটখালা সালেহা। ছাদে তোমার পোষা দুই ময়ূর এবং বাঁদরটা। বাঁদরটার নাম যেন কী? হড়হড়কু না?

জি, হড়হড়কু।

এই অদ্ভুত নামটা কেন দিয়েছ?

লীলা বলল, আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকবার হড়হড়কু বলুন, দেখবেন হড়হড়কু বলার সময় চেহারাটা বাঁদরের মতো হয়ে যায়। এইজন্যেই নাম রেখেছি হড়হড়কু।

আহসান বলল, এক্ষুনি ব্যাপারটা টেস্ট করছি। লীলা, কথা শেষ করার আগে ছোট্ট আরেকটা কথা। ভিন্ন প্রসঙ্গ। বলি?

বলুন।

আমি বিদেশ থেকে যখন আসি, তুমি আমার সঙ্গে আপনি আপনি করে কথা বলো। একটা পর্যায়ে এসে তুমি বলতে শুরু কর, তখন বিদেশে যাবার সময় হয়। বিদেশ থেকে ফিরে আসি, আবার শুরু কর আপনি।

লীলা বলল, এবার যখন তুমি বলা শুরু করব তখন বিদেশ যাবেন না। তাহলেই তো হয়।

আহসান বললেন, এটা মন্দ বলে নি। লীলা রাখি। দেখা হবে সন্ধ্যায়। দ্রুত সেরে উঠ।

চেষ্টা করছি।

থ্যাংক য়্যু

লীলা টেলিফোন রাখার পরপরই আসমা গামলাভর্তি পানি এবং তোয়ালে নিয়ে ঢুকেছে। লীলা বলল, কী?

ম্যাডাম, আপনার গা স্পঞ্জ করে দেব।

লাগবে না।

আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন। আমি গা স্পঞ্জ করছি, দেখবেন কত ভালো লাগবে। ম্যাডাম, আমি আপনার সারা গা স্পঞ্জ করব। আপনি চোখ বন্ধ করে থাকুন। আমাকে লজ্জা করার কিছু নেই।

আসমা গা স্পঞ্জ করছে। লীলা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। তার ভালো লাগছে। মনে হয় জ্বর কমতে শুরু করেছে।

ম্যাডাম, ছাদে আপনার ময়র দুটা দেখে এসেছি। এদের স্বাস্থ্য বেশ ভালো। কিছুদিনের মধ্যেই পালকে রঙ ধরবে।

তুমি জানলা কীভাবে?

আমি কুয়েতে যে শেখের বাড়িতে কাজ করতাম, উনার দশটা ময়ূর ছিল। দুটা ইমু পাখি ছিল। ময়ুরকে খাওয়ানোর জন্যে উনি তার প্রাইভেট প্লেনে করে হংকং থেকে সাপ আনাতেন।

শেখের নাম কী?

অনেক লম্বা নাম— আল হাসান ইবনে মোহম্মদ ইবন জাফর ইবনিল হোসায়ান। সবাই ডাকত শেখ হাসান।

তাঁর চিড়িয়াখানায় আর কী ছিল?

নানান ধরনে পাখি ছিল। কোনো পশু ছিল না। তিনি পশু পছন্দ করতেন। অনেক জাতের ঈগল ছিল। একটা ঈগল ছিল তার পোষা। নাম সাব্বাই। তিনি ছাদে উঠে ঈগলটা ছেড়ে দিতেন। ঈগল সোজাসুজি আকাশে উঠে নিমিষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেত। আবার নেয়ে

এসে তার হাতে বসত। ঈগলকে খাওয়ানোর জন্যে রোজ একটা করে দুম্বা জব হতো। উনার পাখি দেখাশোনার জন্যে চারজন লোক ছিল।

তোমার দায়িত্ব কী ছিল?

ম্যাডাম, আমি, ফিলিপিনের তিন মেয়ে, শ্রীলঙ্কার একটা মেয়ে আর ইন্ডিয়ার একটা মেয়ে, আমরা ছিলাম হাউসমড।

এতজন?

শেখের বাড়িটা ছিল প্রকাণ্ড। শোবার ঘর ছিল একুশটা। ম্যাডাম, বাথরুমে যান, হাতমুখ ধোন। আমি নাশতা আনিচ্ছি। আপনার জ্বর নামছে, গা ঘামছে।

কী নাশতা খাব?

রুটি আর ভাজি। আমি একটা লিস্টি করে রেখেছি। লিস্টি মতো জিনিস আনিয়ে দিলে সকালের নাশতার সমস্যা হবে না।

তোমার ঐ শেখ, উনি সকালে কী নাশতা খেতেন?

প্যারিসের একটা রেস্টুরেন্টের সঙ্গে উনার কন্ট্রাক্ট ছিল। তারা নাশতার ব্যবস্থা করত। উনার এত টাকা যে খরচ করার পথ জানতেন না। ম্যাডাম, আপনার জ্বর এখন আরেকবার মাপব?

দরকার নেই। আমি বুঝতে পারছি জ্বর কমেছে।

আসমা থার্মোমিটার হাতে নিয়ে বলল, জ্বর কতটা কমেছে জানা দরকার ম্যাডাম।

তুমি আমাকে এখন থেকে আপা ডাকবে। ম্যাডাম ডাকবে না। বারবার ম্যাডাম ডাকছ। মনে হচ্ছে আমি সিনেমার নায়িকা। এক্ষুনি ডিরেক্টর সাহেব আমাকে শট দেবার জন্যে ডাকবেন। আমাকে লীলা আপা ভাকবে। যতবার লীলা শব্দটা শুনি আমার ভালো লাগে।

আসমা বলল, আমি আপা ডাকব। লীলা আপা ডাকব না। আপনার নাম ধরে ডাকবেন আপনার প্রিয়জনরা।

লীলা বলল, থার্মোমিটার মুখে দিয়ে আমি এক মিনিট বসে থাকব, কথা বলতে পারব না। এই এক মিনিটে তুমি তোমার স্যার আহসান সাহেব সম্পর্কে যা জানো বলবে।

আসমা বলল, পুরুষমানুষের মধ্যে মন্দভাব বেশি। মন্দ নাই এমন পুরুষ পাওয়া কঠিন। স্যারের মধ্যে মন্দ অংশ কম। আপা, আপনি এক সময় না এক সময় জানবেন এইজন্যে এখনই বলছি— কুয়েতের ঐ শেখ সরু কয়জন মেয়েকে ব্যবহার করত। অনেক ঝামেলা করে আমি ফিরে আসি। আহসান স্যার ফিরে আসার ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমার মতো মেয়েদের পুরুষরা বেশ্যা বিবেচনা করে। তাদের সঙ্গে সেই আচরণ করে। অহসান স্যার কখনো এরকম করেন নি। তিনি সম্মানের সঙ্গেই আমার সঙ্গে কথা বলেন।

আসমা থার্মোমিটার হাতে নিয়ে বলল, আপা, আপনার টেম্পারেচার এখন একশর সামান্য নিচে।

লীলা বলল, শেখের নামটা আরেকবার বলো তো!

আসমা বলল, আল হাসান ইবনে মোহম্মদ ইবন জাফর ইবনিল হোসায়ান।

মুহিব নিলি ম্যাডামের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে। দুজন দারোয়ান গেট পাহারা দিচ্ছে। আর একজন সম্ভবত কেয়ারটেকার জাতীয় কেউ। সে-ই মুহিবকে আটকেছে।

আপনার নাম, কোথেকে এসেছেন সেই ঠিকানা এবং কেন এসেছেন সেটা লেখেন।

মুহিব বলল, এত লেখাপড়া?

জি এইটাই নিয়ম। নিলি ম্যাডাম এই নিয়ম করেছেন। তাকে অনেক উটকা লোক বিরক্ত করে তো এইজন্যে। আপনি করেন কী?

আমি কিছু করি না। আমিও একজন উটকো লোক।

তাহলে দেখা হবে না। লেখালেখি করে লাভ নাই। চলে যান।

এসেছি যখন চেষ্টা করে দেখি।

বসেন ঐ চেয়ারে। দশটা বাজুক। দশটার পর ভেতরে খবর দেব। দশটার আগে ম্যাডামের কাছে খবর পাঠানো নিষেধ।

মুহিব বলল, তিনতলা বাড়ির পুরোটাতেই কি ম্যাডাম থাকেন?

জি।

মুহিব বলল, এমন কেউ কি আছে যাকে আপনারা গেটে আটকান না? সে সরাসরি চলে যেতে পারে। ফ্রি পাশ।

এমন কেউ নাই। ম্যাডামের হাসবেন্ড যদি আসেন তাকেও খবর পাঠাতে হয়।

ম্যাডাম বিবাহিত? জানতাম না তো।

কেয়ারটেকার বলল, সম্পর্ক নাই। দুজন আলাদা থাকে। পুলা একটা আছে। স্যার তরে মাঝে মইদ্যে দেখতে আসে।

মুহিব বলল, ছেলের নাম কী?

পদ্ম।

পদ্ম তো মেয়েদের নাম।

কথা ঠিক বলেছেন, তয় বড়লোকদের কারবার। মেয়ের নাম দেয় ছেলেরে। ছেলের নাম দেয় মেয়েরে।

মুহিব বলল, ভাই, সিগারেট খাওয়া যাবে? না রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেয়ে আসতে হবে?

খান সিগারেট।

মুহিব একটা সিগারেট ধরালো। কেয়ারটেকারের দিকে প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আপনিও একটা খান। আসুন দুই ভাই মিলে ধোয়া ছাড়ি। আপনার নাম কী?

মকবুল।

মকবুল ভাই, সিগারেট ধরান।

মকবুল সিগারেট নিল। গম্ভীর গলায় বলল, আমার সাথে খাতির কইরা লাভ নাই। ম্যাডাম পারমিশন না দিলে No see.

মুহিব বলল, আশেপাশে চায়ের দোকান আছে? চা খেয়ে সময় কাটাই, দশটার পরে একবার এসে খোঁজ নিব পারমিট পাওয়া গেল কি-না।

বড় রাস্তার উল্টাদিকে একটা চায়ের দোকান আছে। চা ভালো বানায়।

পারমিশন পাওয়া গেছে। পারমিশন পাওয়ায় মকবুলকে অসন্তুষ্ট বলে মনে হচ্ছে। সে বিরক্ত মুখে বলল, চলে যান। ফিরত যাবার সময় যে টাইমে ফিব্রত যাচ্ছেন সেই টাইম লিখে যাবেন।

কলিংবেলে হাত রাখার আগেই নিলি দরজা খুলল। কোনো একটা ম্যাগাজিনে (খুব সম্ভব তারকা সংবাদ) মুহিব পড়েছিল, মেকাপ ছাড়া নায়িকাদের চেহারা প্রায় পেতনির কাছাকাছি। নিলি মনে হয় তার মধ্যে পড়েন না। তাকে মেকাপ ছাড়া অনেক বেশি মিষ্টি লাগছে।

নিলি বলল, মুহিব বসুন। আমার মন বলছিল আজকালের মধ্যে আপনি নাটকের বিষয়ে সুপারিশ করতে আসবেন। সুপারিশ করতে আসা দোষের কিছু না। জীবনের প্রথম নাটক প্রচারিত হোক সবাই চায়। আমি কিন্তু ঐ নাটকটা করব না।

মুহিব বলল, ম্যাডাম, আমি সুপারিশ করতে আসি নাই। আমার কপালে আছে সবকিছুতে আমি ফাইনাল পর্যন্ত যাব, তারপর ভজঘট হয়ে যাবে।

তাই না-কি?

জি। টুথপেস্টের একটা অ্যাড করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সব ফাইনাল। যেদিন শুটিং হবে সেদিন ডিরেক্টর বললেন আমাকে দিয়ে হবে না। আমার চোখে না-কি মায়া নাই।

ডিরেক্টর সাহেবের নাম কী?

নাম মনে নাই।

চোখে মায়া নেই বলে বিজ্ঞাপন বাতিল?

জি।

নিলি বলল, চোখের মায়াটা আসলে কী?

মুহিব বলল, জানি না।

নিলি বলল, ভালো করে তাকিয়ে দেখুন তো। আমার চোখে কি মায়া আছে?

মুহিব কী বলবে বুঝতে পারছে না। লীলার মতো সহজ সম্পর্ক থাকলে বলতো, ম্যাডাম আপনার চোখে তেমন মায়া দেখছি না। কাঠিন্য দেখছি। বিজ্ঞাপনের ছবিতে কাজ করতে গেলে ডিরেক্টর সাহেব আপনাকেও বাদ দিয়ে দিতেন।

নিলি বলল, আমার চোখে মায়া নেই এই কথাটাই তো বলতে চাচ্ছেন। চক্ষুলজ্জায় বলতে পারছেন না। ঠিকই ধরেছেন। আমার দৃষ্টি কঠিন। যখন আমি আমার ছেলের দিকে তাকাই, তখন দৃষ্টি কোমল হয়। চোখে মায়া চলে আসে। চোখের মায়ার এই হচ্ছে রহস্য। চোখের মায়া গণবিষয় না। শুধুমাত্র প্রিয়জনদের জন্যে। আরো রহস্য আছে। জানতে চান? জানলে অভিনয়ে সুবিধা হবে।

মুহিব বলল, বলুন।

নিলি বলল, আপনি আপনার সামনের পেইন্টিংটার দিকে তাকান। কী দেখছেন?

পাথরের ওপর পাখি বসে আছে।

নিলি বলল, মানুষের চোখের দৃষ্টি হচ্ছে Convergent, দুই চোখের দৃষ্টি একবিন্দুতে মিলে। যদি ইচ্ছা করে মিলতে না দেয়া হয়, তাহলেই চোখে মায়া চলে আসে। আপনি এখন পেইন্টিং-এর দিকে তাকিয়ে থাকুন, তবে ছবি দেখবেন না। ডান চোখে দেখার চেষ্টা করেন পেইন্টিং-এর ডান ফ্রেম। বাঁ চোখে বা ফ্রেম। একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে। এই তো হয়েছে। এবং আপনার চোখে মায়া চলে এসেছে।

মুহিব বলল, চোখে মায়া আনার ব্যাপারটা কি কেউ আপনাকে শিখিয়েছে?

নিলি বলল, না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেই বের করেছি। ভালো কথা, আপনার বাসায় কি বড় আয়না আছে? পুরো শরীর দেখা যায় এমন আয়না?

না।

বড় একটা আয়না কিনবেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলবেন।

লাভ কী?

অভিনয় ভালো হবে। এক্সপ্রেশন ভালো হবে। শব্দ করে হাসবেন। এতে মুখের চামড়ায় ফ্লেক্সিবিলিটি আসবে। আপনাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু টিপস দিয়ে দিলাম। কারণ জানতে চান?

চাই।

আপনি খুব ভালো একটা দিনে এসেছেন। আজ আমার বাবুর জন্মদিন। দুবছর আগে এইদিনে সকাল দশটা চল্লিশ মিনিটে বাবু জন্মেছিল। ডাক্তার যখন আমার কোলে বাবুকে দিল আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, ডাক্তার সাহেব, এই পদ্মফুল কি আমার? সেই থেকে ছেলের নাম পদ্ম!

নিলির চোখে পানি এসে গেছে। সে কোনোরকম অস্বস্তি বোধ না করে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। মুহিব বলল, আপনার পদ্মকে কি একটু দেখতে পারি?

নিলি বলল, না। পদ্মার বাবা তাকে নিয়ে গেছেন। পদ্মার কাস্টডি নিয়ে মামলা চলছিল। মামলায় সে জিতেছে। সাত বছর বয়স পর্যন্ত সব মায়েরা বাচ্চাকে রাখার অধিকার পায়। আমি পাই নি। কারণ তার বাবা কোর্টে প্রমাণ করতে পেরেছেন। আমি চরিত্রহীনা নারী। আমার বাড়িতে রোজা রাতে দুষ্ট লোকের আড্ডা হয় মদ্যপান করা হয়। অভিনয়ের নাম করে আমি দিনের পর দিন বিভিন্ন শুটিংস্পটে রাত কাটাই। আমার ছেলে কাজের মেয়েদের কাছে একা একা থাকে। বাবুর যে মূল আয়া সজিরন কোর্টে তাই বলেছে। বাবুর বাবা সজিরনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছেন। পঞ্চাশ হাজার টাকা ওদের কাছে অনেক বড় ব্যাপার।

মুহিব বলল, সজিরন কি এখন বাড়িতে পল্লীর দেখাশোনা করে?

ঠিকই ধরেছেন। আপনার বুদ্ধি ভালো। আপনি অভিনয় ভালো করবেন। বেকুবরা অভিনয় করতে পারে না। চা খাবেন?

মুহিব বলল, না। আমি চা খেয়ে এসেছি। রাস্তার মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে, ভালো চা বানায়। সেখান থেকে পরপর তিনকপি চা খেয়েছি। চা এরকম যে এক কাপ খেলে আরেক কাপ খেতে ইচ্ছা হয়।

নিলি বলল, আফিং টাফিং নিশ্চয় মেশায়া চা এমন কোনো নেশার জিনিস যে পরপর তিন কাপ খেতে ইচ্ছা করবে। একদিন খেয়ে দেখতে হবে।

মুহিব বলল একটা ফ্লাস্ক দিন। ফ্লাস্কে করে নিয়ে আসি।

নিলি বলল, চা আনতে হবে না। আচ্ছা শুনুন, সন্ধ্যাবেলা একটা কাজকরে দিতে পারবেন?

মুহিব বলল, পারব।

নিলি বলল, কী কাজ না জেনেই বললেন পারব?

মুহিব বলল আমার ধারণী পদ্মার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে তাকে আপনি উপহার। পাঠাবেন। সেই উপহার নিয়ে যেতে হবে আমাকে।

নিলি বলল, ঠিক ধরেছেন। ফ্লাস্ক দিচ্ছি। চা নিয়ে আসুন।

চুহিব বলল, গিফট কি কেনা হয়েছে?

নিলি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ। বড় একটা গাড়ি কিনেছি। ব্যাটারি অপারেটেড প্যাডেলে চাপ দিলেই গাড়ি চলবে। পদ্মর বয়স দুবছর–প্যাডেলে চাপ দেয়ার বিষয়টা সে বুঝতে পারবে কিনা জানি না। আমার ধারণা বুঝবে। ওর অনেক বুদ্ধি। ওর বুদ্ধির একটা গল্প শুনবেন?

শুনব।

নিলি বলল, না থাক।

নিলির চোখে পানি এসে গেছে। সে চোখ মুছছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, মুহিবের চোখে পানি এসে গেছে। সে অন্যদিকে ঘুরে তাকিয়ে আছে। সে চাচ্ছে চোখের পানি যেন চোখেই শুকিয়ে যায়। সে চোখের পাতা ফেলছে না।

মুহিব!

জি ম্যাডাম। You are a good soul, আমি যে নাটকটা করব না বলেছিলাম সেটা করব। আপনার জীবনের প্রথম অভিনয় নষ্ট হতে দেব না।

ম্যাডাম, অভিনয় নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। হলে হবে। না হলে হবে না।

নিলি হাসতে হাসতে বলল, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আপনি হিমু হবার চেষ্টা করছেন। আপনার কি রূপা বলে কেউ আছে?

মুহিব বলল, আছে। তার নাম লীলা।

বাহ কী সুন্দর নাম!

লীলার একটা পোষা বদর আছে। বাঁদরটার নাম সুন্দর–হড়হড়কু।

সুন্দর কোথায়? অদ্ভুত নাম। এই নাম কেন?

লীলার ধারণা এই নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখ খানিকটা বাঁদরের মতো হয়। ওর দুটা পোষা ময়ুর আছে। একটার নাম চিত্রা আরেকটার নাম মিত্রা।

নিলা বলল, আপনার বান্ধবীকে দেখার ইচ্ছা করছে। আপনাদের প্রথম দেখা কীভাবে হয়?

নর্দমাতে দেখা। লীলা এই নিয়ে চারলাইনের একটা ইংরেজি কবিতাও লিখেছে, শোনাব?

অবশ্যই শোনাবেন।

মুহিব বলল,

We were in the drain
I looked at him and saw his pain
with weariness and fault
I cave the dirty stain.

লীলার জ্বর নেই তবে চেহারায় জ্বরের ছায়া পড়ে আছে। তাকে ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ লাগছে। তার ইচ্ছা করছে বিছানায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতে। লবণ-বাতির রহস্য আলো ছাড়া ঘরে আর কোনো আলো থাকবে না। লবণ-বাতি লীলার ছোট মামা স্পেন থেকে পাঠিয়েছেন। খনিজ লবণের একটা টুকরার ভেতর বাল্ব জ্বলে। বাল্বের আলো লবণের দেয়াল ভেদ করে আসার সময় অদ্ভুত লাল হয়ে যায়। লীলা এই লালের নাম দিয়েছে লবণ-লাল। এই লাল রঙ নিয়ে সে অনেকদিন থেকে একটা কবিতা লেখার চেষ্টা করছে। প্রথম লাইনটা মাথায় এসেছে— When the salt red glows in the dark radiating sorrow...। দ্বিতীয় লাইন আসছে না।

লীলা বসার ঘরে সোফায় বসে আছে। তার সামনে আদার রস দেয়া এক কাপ গ্রিন টি। সে মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। তার সামনে আহসান বসে আছে। তার গায়ে হালকা মেরুন রঙের পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির রঙের সঙ্গে লবণ-আলোর মিল আছে। দ্রলোককে সুন্দর লাগছে। আহসান নিচু গলায় কথা বলে যাচ্ছে। লীলা আগ্রহ নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে তার প্রতিটি কথা সে মন দিয়ে শুনছে। আসলে তা-না। লীলার মাথায় লবণ-আলো কবিতার দ্বিতীয় লাইন ঘুরছে। দুটা মাত্র শব্দ মাথায় এসেছে Radiating sorrow...। আর আসছে না।

আহসান বলল, লীলা, তুমি কি ডেভিড ব্রেইনের নাম শুনেছ?

লীলা বলল, না। উনি কি কবি?

আহসান বলল, ম্যাজিকের কবি। street magician, অসাধারণ সব ম্যাজিক দেখান।

তার কথী এল কেন?

আমি নিউইয়র্কে তার একটা ম্যাজিক দেখেছি। Levitation Magic.

লেভিটেশন ম্যাজিক মানে?

লেভিটেশন মানে শূন্যে ভাসা। উনি নিউইয়র্কের ব্যস্ত রাস্তায় সবার সামনে শূন্যে ভেসেছেন। রাস্তা থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে উঠে দুই মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড ছিলেন।

লীলা বলল, দুই মিনিট শূন্যে ভেসে লাভ কী?

মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে দুই মিনিটের জন্যে অগ্রাহ্য করে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছেন, এইটাই লাভ। লীলা, তুমি মনে হয় মন দিয়ে আমার কথা শুনছ

। আবার জ্বর আসছে না-কি? দেখি হাতটা বাড়াও তো, জ্বর দেখি।

লীলা হাত বাড়াল। আহসান লীলার হাত ধরল। লীলা মনে মনে গুনছে one thousand one, ore thousand two one thousand three...

আহসান কতটা সময় হাত ধরে থাকে সেটা জানার জন্যেই one thousand one, two... বলা। একবার one thousand one বলতে এক সেকেন্ড লাগে।

লীলার হিসেবে এগারো সেকেন্ড পর আহসান হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, মনে হচ্ছে জ্বর আসছে।

লীলা বলল, আসুক। ঝড় আসছে আসুক।

ঝড় বলছ কেন?

লীলা বলল, জ্বর হলো শরীরের ঝড়। এই কারণেই ঝড় বলছি। ম্যাজিক সম্বন্ধে কী বলছিলেন বলুন। ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক দুই মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড শূন্যে ঝুলে রইলেন।

আহসান বলল, তুমি মনে হয় ridicule করছ। সবার সামনে কোনো যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া শূন্যে ভেসে থাকা কঠিন কাজ। যে দেখে তার মধ্যে এক ধরনের অলৌকিক অনুভূতি হয়। তুমি দেখবে?

লীলা বলল, আমি কীভাবে দেখব? ব্লেইন সাহেবকে আমি কোথায় পাব?

আহসান বলল, আমি দেখাব।

লীলা বলল, আপনি দেখবেন মানে? আপনি ম্যাজিক জানেন না-কি?

ম্যাজিক জানি না, তবে দেশের বাইরে যখন যাই দুই একটা ইজি আইটেম ম্যাজিক শপ থেকে কিনে নিয়ে আসি।

শূন্যে ভাসা ইজি আইটেম?

কৌশলটা খুবই সহজ। Optical illusion তৈরি করা। শূন্যে ভাসার ডেভিড ব্লেইনের এই ভার্সানটার কৌশল জানতে তিনশ ডুলার খরচ করতে হয়েছে। তোমাকে দেখাব?

দেখান।

আহসান উঠে দাঁড়াল। ঘরের শেষমাথায় চলে গেল। বড় করে নিঃশ্বাস ফেলে একটু নিচু হলো, তারপর লীলাকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি শূন্যে ছয় ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল। লীলা বলল, Oh God!

আহসান শূন্য থেকে নামতে নামতে বলল, আনন্দ পেয়েছ?

লীলা বলল, অবশ্যই আনন্দ পেয়েছি।

কৌশলটা শিখিয়ে দেব?

লীলা বলল, না। কৌশল কেন শেখাবেন? কৌশল শিখলে তো রহস্যই নষ্ট। তবে আপনি মুহিবকে দেখাতে পারেন। মাঝে মাঝে সে শূন্যে ভেসে আমাকে দেখাবে। আমি মজা পাব।

আহসান ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আচ্ছা তাকে শিখিয়ে দেব।

লীলা বলল, এখন একটা কাজ করুন, আপনার শূন্যে ভাসার খেলা বাবাকে দেখিয়ে আসুন। বেচারা একা একা ঘরে বসে আছে।

আহসান বললেন, তুমি চল। তিনজন মিলে গল্প করি।

লীলা বলল, আমার জ্বর আসছে। জ্বর আসার সময় বাবার বক্তৃতা অসহ্য লাগে। আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। ডিনারের সময় আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আপনার সঙ্গে ডিনার করব।

লীলা উঠে দাঁড়াল। তাকে দ্রুত বিছানায় শুয়ে পড়তে হবে। কবিতার দ্বিতীয় লাইনটা মনে হয় চলে এসেছে।

আহসানকে পেয়ে শওকত সাহেব আনন্দিত।

তিনি নতুন একটা বই পড়ছেন। বইয়ে বিবর্তনবাদের জনক Darwin সাহেবকে ধরাশায়ী করা হয়েছে। বিষয়টায় তিনি বিপুল আনন্দ পেয়েছেন। তার পূর্বপুরুষ বানর এটা তিনি নিতেই পারতেন না। এখন সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি আহসানের দিকে ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি ডারউইনবাদে বিশ্বাস কর?

আহসান বলল, জি চাচা করি।

তোমার বিশ্বাস তুমি এখন যে-কোনো একটা ভালো ডাস্টবিন দেখে ফেলে দিয়ে আসতে পার?

আহসান বলল, জি আচ্ছা।

পুরো বিষয়টা না শুনেই জি আচ্ছা বলবে না। আগে পুরো বিষয়টা শোন।

আহসান হতাশভঙ্গিতে পুরো বিষয়টা শোনার জন্যে প্রস্তুত হলো। সহজে এই বিরক্তিকর মনুষটার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

শওকত সাহেব বললেন, তোমাদের ডারউইনের থিওরি বলে পাখি এসেছে সরীসৃপ থেকে। তুমি এখন একটা সাপ এবং ময়ূর পাশাপাশি রাখ। চিন্তা কর যে ময়ুরের পূর্বপুরুষ সাপ। যে সাপ এখন ময়ূরের প্রিয় খাদ্য। বলো তোমার কিছু বলার আছে?

এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই চাচা।

মনে মনে দশের ওপরে ৯৫০টা শূন্য বসাও। এই বিশাল প্রায় অসীম সংখ্যা দিয়ে এককে ভাগ কর। কী পাবে জানো? শূন্য। এটা হলো অ্যাটমে অ্যাটমে ধাক্কাধাক্কি করে DNA অনু তৈরির সম্ভাবনা। মিলার নামে কোনো সাইন্টিস্টের নাম

শুনেছ? ছাগলটাইপ সাইনটিস্ট।

চাচা, শুনি নি।

ঐ ছাগলটা ১৯৫০ সনে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অন্য ছাগল সাইন্টিস্টদের মধ্যে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। ছাগলটা করেছে কী, ল্যাবরেটরিতে আদি পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরি করে ঘনঘন ইলেকট্রিক কারেন্ট পাস করেছে। কিছু প্রোটিন অনু তৈরি করে বলেছে— এইভাবেই পৃথিবীতে প্রাণের শুরু। প্রাণ সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোনো ভূমিকা নেই। এখন

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

সেই ছাগল মিলারকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে হাসাহাসি। Life ম্যাগাজিনে কী লেখা হয়েছিল পড়ে শোনাই।

চাচা, আরেকদিন শুনি। জটিল কিছু শোনার জন্যে আমি এই মুহূর্তে মানসিকভাবে তৈরি না।

শওকত সাহেব বললেন, জটিল কিছু বলছি না। জলবৎ তরলং। মন দিয়ে শোন। আন্ডারলাইন করে রেখেছি।

শওকত সাহেব পড়তে শুরু করলেন। আহসান হতাশ চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইল।

Geologist now think that the premordial atmosphere consisted mainly of carbon dioxide and Nitrogen gases that are less reactive than those used in the 1953 Mitler experiment...

পদ্মর জন্মদিন অনুষ্ঠানে মুহিব উপস্থিত হয়েছে। তার হাতে গিফট র্যাপ দিয়ে মোড়ানো বিশাল বাক্স দেখে দারোয়োন কিছু জিজ্ঞেস করল না। দারোয়ান বলল, ছাদে চলে যান। ছাদে প্যান্ডেল খাটিয়ে উৎসব।

ছাদে উঠে মুহিব পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। বিশাল প্যান্ডেল। প্যান্ডেলের এক মাথায় স্টেজ করা হয়েছে। বিচিত্র পোশাক পরা একজন ডিসকো জকি ভয়ঙ্কর ধরনের বাজনা বাজাচ্ছেন। সেই বাজনার সঙ্গে ছেলেমেয়েরা যার যেমন ইচ্ছা নেচে যাচ্ছে। পাশেই বার

তৈরি করা হয়েছে। নানান সাইজ এবং নানান ধরনের বোতল টেবিলে ঝলমল করছে। দুজন বারটেন্ডার ড্রিংক্স দিচ্ছে। বারের ওপর বড় বড় করে লেখা–

Dont over do it. মুহিব উপহারের বাক্স নিয়ে কী করবে বুঝতে পারছে না। এখানে কারো হাতেই উপহারের কোনো প্যাকেট দেখা যাচ্ছে না। হলুদ ব্লেজার পরা অতি সুদর্শন এক ভদ্রলোক এসে মুহিবের সামনে দাঁড়ালেন। বিনয়ী গলায় বললেন, আপনার পরিচয় জানতে পারি?

মুহিব বলল, আমি পদ্মর জন্যে একটা উপহার নিয়ে এসেছি। পদ্মর মা পাঠিয়েছেন।

ভদ্রলোক ইশারা করে কাকে যেন ডাকলেন। তাকে বললেন, জলিল, উনার কাছ থেকে গিফট নিয়ে যাও।

মুহিব বলল, নিলি ম্যাডাম বলে দিয়েছেন আমি যেন নিজের হাতে তাকে গিফটটা দেই।

ভদ্রলোক বললেন, জলিল, উনাকে পদ্মর কাছে নিয়ে যাও। আর ভাই, আপনি গিফট দিয়ে ছাদে চলে আসবেন। পার্টি এনজয় করবেন। আপনার নাম?

মুহিব।

মুহিব সাহেব, পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

ঘরভর্তি উপহারের মাঝখানে একটা দুবছরের বাচ্চা লাল শার্ট লাল প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে উপহার দেখছে। কোনো একটা বাক্সে হাত দেয়া মাত্র বৃদ্ধা এক মহিলা ধমক দিচ্ছে, হাত দিবা না কইলাম।

মুহিবের মনে হলো এই মহিলাই সজিরন। পদ্মর আয়া।

মুহিব বলল, পদ্ম! কাছে আস, তোমার মা তোমার জন্যে কী পাঠিয়েছেন দেখ।

পদ্ম পরিষ্কার গলায় বলল, আমার মা পাঠিয়েছে?

মুহিব বলল, হ্যাঁ।

নিলি মা পাঠিয়েছে?

হ্যাঁ।

বলেছে—বাবুকে আদর?

হ্যাঁ বলেছেন। এসো আমরা উপহার খুলি।

পদ্ম ছুটে এল। বৃদ্ধা খ্যাখ্যান গলায় বলল, বাক্স এখন খোলা স্যারের নিষেধ আছে। পরে খোলা হবে। একপাশে থুইয়া দেন। সময় বুইঝা খোলা হইব।

মুহিব বলল, তোমার নাম সজিরন না?

জে।

মুহিব বলল, বাঘের ওপরে আছে টাগ। তোমার স্যারের ওপরে আছে নিলি ম্যাডাম। তুমি মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছ, এই খবর আমরা জানি। হাইকোর্টে আপিল করা হয়েছে। যদি প্রমাণ হয় তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছ, তোমার চার বছরের জেল হবে। জেলে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে যাও। পান খাওয়ার অভ্যাস আছে দেখতে পাচ্ছি। অভ্যাস ছাড়ার চেষ্টা কর। জেলে পান পাবে না। সমস্যা হবে।

মুহিব প্যাকেট খুলছে। পদ্ম ছোট ছোট হাতে তাকে সাহায্য করছে। এবং টুক টুক করে কথা বলছে।

গোলাপ ফুল আমাকে গোঁতা দিয়েছে।

মুহিব বলল, কাটা লেগেছে হাতে?

হুঁ। এইখানে।

পদ্ম হাত বাড়িয়ে বলল, উম্মা দাও।

উম্মা ব্যাপারটা কী মুহিব বুঝতে পারছে না।

সজিরন বলল, হাতে চুমা দিতে বলতাছে।

মুহিব সজিরনের দিকে তাকিয়ে বলল, এই বেটি খবরদার, আমার সাথে কথা বলবি না। বদের হাড্ডি। ইয়া নফসি ইয়া নফসি করতে থাক। তোর কপালে দুঃখ আছে।

সজিরন বলল, আমি স্যারের বগলে যাইতেছি। আপনি কী বলছেন সব বুলব।

মুহিব বলল, যা তাড়াতাড়ি যা।

সজিরন ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র মুহিব পদ্মকে গাড়িতে বসিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এখানে বেশিক্ষণ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মুহিব বাড়িতে ফিরল রাত নটায়। বাড়িতে ঢুকতে পারল না।

বাড়ির সামনে ভিড়। লোকজন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। পুলিশের একটা জিপ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। সেই গাড়ি ঘিরেও ভিড়। মুহিবের চোখের সামনে তার বাবা আলাউদ্দিনকে পুলিশের গাড়িতে তুলল। আলাউদ্দিনের হাতে হাতকড়া। কোমরে দড়ি। তিনি বিড়বিড় করে দোয়া ইউনুস পড়লেন। মুহিব পুলিশের গাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। সে বাবা বলে চিৎকার দিতে যাচ্ছে, তার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

৪. তিনটা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায়

তিনটা খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় আলাউদ্দিনের ছবি ছাপা হয়েছে। তাদের সংবাদ শিরোনাম–

প্রধান শিক্ষক কর্তৃক
ছাত্রী ধর্ষিত।

কোচিং সেন্টারে প্রধান শিক্ষক
কর্তৃক ছাত্রী ধর্ষণের চেষ্টা।
শিক্ষক হাজিতে।

কন্যাসম ছাত্রী
শিক্ষকের যৌন লালসার শিকার।
ধর্ষণের চেষ্টাকালে শিক্ষক ধৃত।

মুহিব হাজতে তার বাবার সামনে বসে আছে। সে তার বাবার দিকে তাকাতে পারছে না। অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। আলাউদ্দিন সিগারেট খান না। তার হাতে সিগারেট। ভুস ভুস করে ধোয়া ছাড়ছেন। তার চোখ রক্তবর্ণ। চুল উসকোখুসকো। একটা চোখের নিচে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে।

মুহিব বলল, মারধোর করেছে না-কি বাবা?

আলাউদ্দিন বললেন, হুঁ। ওসি সাহেবকে টাকা খাওয়াতে হবে। টাকা খাওয়ালে মারধোর হবে না। চেকবই আনতে বলেছিলাম, এনেছিস?

হুঁ।

ব্যাংকে এক লাখ বিশ হাজার টাকা আছে। চেক লিখে দেই। পুরাটাই তুলবি। ওসি সাহেবকে দিবি দশ হাজার। হাতেপায়ে ধরে বলবি, এর বেশি দেওয়ার সামর্থ্য নাই। পায়ে ধরতে পারবি না?

পারব।

অশ্রুকে সাথে নিয়ে আসিস। সেও যেন ওসি সাহেবের পায়ে ধরে। এক লাখ বিশ থেকে দশ চলে গেল। বাকি থাকল এক লাখ দশ। দশ দিবি উকিলকে। হমিদুজ্জামান নামে আমার পরিচিত এক ক্রিমিনাল লইয়ার আছে। ঘাগু লোক। ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি, তার সঙ্গে দেখা করবি।

আচ্ছা।

এক লাখ টাকা নিয়ে ঐ মেয়েটার সঙ্গে দেখা করবি। তোর মাকে সাথে নিয়ে যাবি। মামলা যাতে তুলে নেয় সেই ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখবি। টাকা আগেই দিবি না। যদি বলে মামলা তুলে নিবে তখন দিবি। মনে হয় তুলবে না।

মেয়েটার নাম কী?

সালমা। বাবার নাম আশরাফ। তার ঠিকানা জানি না। মিরপুরে কিসের যেন দোকান আছে। খুঁজে বের করবি। কোচিং সেন্টারের রেজিষ্টারে ঠিকানা আছে। বের করতে পারবি না?

পারব।

আলাউদ্দিন হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে আরেকটা ধরলেন। কিছুক্ষণ কাশলেন, তারপর লম্বা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, তুই অন্যদিকে তাকিয়ে আছিস কী জন্যে? কোনোরকম ঘটনা ঘটে নাই। মিথ্যা মামলা।

মিথ্যা মামলা?

অবশ্যই। যে-কোনো গাধা বুঝবে মিথ্যা মামলা। তোর বৃদ্ধি গাধারও নিচে বলে ভেবেছিস সত্যি। বাবার দিকে তাকাচ্ছিস না। অথচ আমি তোর জন্মদাতা পিতা। এক হাদিসে আছে— রসুলুল্লাহ সাল্লালাহে আলায়হেস সালাম বলেছেন, আমি যদি আল্লাহপাক ব্যতীত অন্যকাউকে সেজদা দেয়ার হুকুম দিতাম সে হতে জন্মদাতা পিতা। বুঝেছিস?

জি।

মামলা যে মিথ্যা প্রমাণ দেই। যদিও তোর কাছে প্রমাণ দেয়ার কিছু নাই। তুই তো হাকিম না। প্রমাণ করতে হবে কোর্টে। যাই হোক শোন, ঘটনা ঘটেছে বেলা বারোটায়। বারোটায় কোচিং-এর ক্লাস হচ্ছে। চারদিকে ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে আমি এক মেয়েকে ঘরে ঢুকাব। দরজার ছিটকানি লাগাব। এটা কি সম্ভব? আর ঐ হারামজাদি সালমা দেখছে আমি দরজা

বন্ধ করছি, সে কিছুই বলবে না? সে একটা চিৎকার দিলেই তো সব ছুটে আসে। দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করতে হয় না। বুঝতে পারছিস?

হুঁ।

মিথ্যা মামলাটা কেন করেছে শোন। কোচিং সেন্টারে আমার শেয়ার ফিফটি, বাকি ফিফটি হিশামের। চলে আমার নামে আলাউদ্দিন কোচিং সেন্টার। সবাই একনামে চিনে। গত বছর থেকে টাকা আসা শুরু হয়েছে। আমাকে আউট করা দরকার। পুরা ঘটনা সাজায়েছে হিশাম। সালমা মেয়েটা তার আত্মীয়। ভাগ্নি না কী যেন হয়।

আমি কি হিশাম চাচার সঙ্গে দেখা করব?

করতে পারিস। যা করবি বিবেচনা করে করবি। গাধার মতো কিছু করবি। মাথা ঠান্ডা রাখবি। যে-কোনো বিপদ থেকে উদ্ধারের একটাই পথ— মাথা ঠান্ডা রাখা। You got to keep your head cool, চেকবইটা দে। এক কাপ চা জোগাড় করা যায় কি না দেখ।

ক্রিমিনাল লইয়ার হামিদুজ্জামানের চেহারা ক্রিমিনালদের মতো। মুখভর্তি খোচা খোচা দাড়ি। ছোট ছোট চুল। মাথা কামানো। যখন কথা বলেন না তখন ঠোঁট উল্টে রাখেন। তার টেবিলে ছোট্ট আয়না আছে। ঠোঁট উল্টে আয়নায় নিজেকে দেখেন। চেয়ারের পাশে পিতলের পিকদানি। কিছুক্ষণ পরপর সেখানে থুথু ফেলেন।

মুহিব বলল, স্যার। বাবা বলেছেন, মিথ্যা মামলা।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

হামিদুজ্জামান থুথু ফেলে কিছুক্ষণ ঠোট উল্টা করে বসে রইলেন। তারপর বললেন, বাবারে, সত্য মামলা মিথ্যা মামলা বলে কিছু নাই। মামলা হলো জজ সাহেব। উনি যখন বলবেন মামলা মিথ্যা, তখন সত্য মামলাও মিথ্যা। টাকাপয়সা কী এনেছ?

দশ হাজার টাকা এনেছি।

যেখানে এক সমুদ্র পানি লাগে সেখানে এক চামচ পানি নিয়ে উপস্থিত হয়েছ। মামলার ধরন খারাপ। নন বেলেবল। জামিন হবে না। সেখানে কোর্টে চালান করা মাত্র জামিনে ছাড়ায়ে নিয়ে আসব। আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য দিয়ে তো আনতে পারব না। টাকা দিয়ে ছুটায়ে আনতে হবে। মেয়ের ডাক্তারি পরীক্ষা কি হয়েছে?

জানি না।

ভোমার জানার প্রয়োজনও নাই। যদি মামলা আমি নেই তখন আমিই জানব। ডাক্তারকে টাকা খাওয়ায়ে সার্টিফিকেট বের করব ধর্ষণের আলামত সনাক্ত করা যায় নাই। এই বাবদই শুধু লাগবে পঞ্চাশ হাজার। বুঝেছ?

জি। এত টাকা তো আমাদের নাই চাচা।

হামিদুজ্জান থুথু ফেললেন। ঠোট উল্টে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন, তাহলে তো বাবা কিছু করার নাই। তোমার পিতাজিকে কম করে হলেও সাত বছর জেলে থাকতে হবে। তোমাকে পরিষ্কার বলি, ক্রিমিনাল লইয়ার হিসাবে আমার নামডাক আছে।

লোকে বলে, ফাঁসির দড়ির ভেতর থেকে আমি আসামি খালাস করে আনতে পারি। কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। তবে লইয়ার আমি ভালো না। আমি টাকা খাওয়ানোতে ভালো। কাকে টাকা খাওয়াতে হবে, কীভাবে টাকা খাওয়াতে হবে, এটা আমি জানি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা নৃত্যনাট্য আছে, নাম মায়ার খেলা। কোর্টের নৃত্যনাট্য হলো— টাকার খেলা। তুমি যাও, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলে। ব্রুতে মিনিমাম এক লাখ টাকার ব্যবস্থা করতে পারলে আসবে। ব্যবস্থা করতে না পারলে আসবে না। তোমার বাবা আমার পূর্বপরিচিত, এটা ঠিক আছে। পরিচয়ে কিছু হবে না। তোমার বাবাকে কি কোর্টে চালান দিয়েছে? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোর্টে হাজির করার নিয়ম। রিমান্ডের অর্ডার যদি পুলিশ বের করে ফেলে তাহলে সাড়ে সর্বনাশ।

মুহিব বলল, দশ হাজার টাকা নিয়ে এসেছি চাচা, টাকাটা কি রাখবেন?

হামিদুজ্জামান থুথু ফেলতে ফেলতে বললেন, না।

মুহিব উঠে দাড়াল। এখন সে যাবে আলাউদ্দিনের কোচিং বিজনেসের পার্টনার হিশাম সাহেবের কাছে। মুহিব তাকে ভালো করেই চেনে। অনেকবার তাদের বাড়িতে এসেছেন। শান্ত-ভদ্র চেহারা। হজ্জ করে আসার পর দাড়ি রেখেছেন। চোখে সুরমা দেন। গলার স্বর মিষ্টি।

হিশাম সাহেব কোচিং সেন্টারেই ছিলেন। মুহিকে দেখে বললেন, তুমি আসবে জানতাম। কী ঘটনা ঘটে গেছে দেখেছ? কেউ কি আর এই কোচিং সেন্টারে ভর্তি হবে? ছিঃ ছিঃ, কী

কেলেংকারি! সালমা মেয়েটা আমার আপন ভাগ্নি। তার সামনে মুখ দেখাতে পারি না। আমি তাকে বললাম, দরজা ভেঙে তোকে বের করতে হলো কেন? আগে চিৎকার দিলি না কেন? গাধি মেয়ে বলে, লজ্জায়। এখন লজ্জা কই গেল! দুনিয়ার পত্রিকার তোক বাড়িতে আসছে। এক টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক এসেছে ক্রাইম রিপোর্টিং করবে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

মুহিব বলল, চাচা, আমি কি সালমা মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে পারি?

কী কথা বলবে?

মুহিব চুপ করে রইল। হিশাম বললেন, তোমার তো কথা বলার কিছু নাই। তোমার বাপ এত বড় একটা ঘটনা ঘটায়েছে— তুমি ছেলে হয়ে তার সামনে যাকে কীভাবে?

মুহিব বলল, তাও ঠিক।

হিশাম বললেন, জানাজানি বেশি হয়ে গেছে। জানাজানি কম হলে ঘটনা ধামাচাপার ব্যবস্থা করতাম। এখন সেই পথও নাই।

চাচা, মেয়েটার সঙ্গে কি আমি টেলিফোনে কথা বলতে পারি?

তুমি কথা বলার জন্য কেন অস্থির হয়েছ বুঝলাম না। তোমার কথা বলার তো কিছু নাই।

মুহিব বলল, বাবার হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইতাম। পায়ে ধরে পড়ে থাকতাম।

তুমি কি ভেবেছ পায়ে ধরে পড়ে থাকলেই সে মামলা তুলে নিবে?

মামলা তুলতে তো চাচা বলছি না। মামলায় বাবার যা হয় হবে। আমরা উকিলও দেই নাই।

দাও নাই কেন?

উকিল যত টাকা চায় অত টাকা নাই। আমি ধরেই নিয়েছি বাবার সাত বছরের জেল হবে।

হিশাম বললেন, তুমি সালমার সঙ্গে কথা বলতে চাও দেখি কী করা যায়। কয়েকটা দিন যেতে দাও। পরিস্থিতি ঠান্ডা হোক। মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। জামাই জনতা ইনস্যুরেন্সের ক্যাশিয়ার। বিয়ে ভেঙে গেছে। এই নিয়েও বাড়িতে কান্নাকাটি। এই মেয়ের আর বিয়ে হবে বলে মনে হয় না।

সন্ধ্যাবেলা মুহিব গেল লীলার কাছে। লীলা চমকে উঠে বলল, কী হয়েছে? তোমাকে এরকম লাগছে কেন?

মুহিব বলল, আজকের কাগজ পড়েছ? কাগজের ফ্রন্ট পেজে বাবার ছবি ছাপা হয়েছে। কয়জনের বাবার ছবি ফ্রন্ট পেজে ছাপা হয়? এই আনন্দেই আমার

চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে।

লীলা বলল, উনার নাম কি আলাউদ্দিন?

হ্যাঁ।

লীলা বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, তুমি দুপুরে কিছু খেয়েছ?

না।

বাথরুমে যাও, হাত-মুখ ধোও। তারপর টেবিলে আস। মাংস রান্না করা আছে। পরোটা ভেজে দেবে। নতুন একটা মেয়ে পেয়েছি। আসমা নাম। ভালো পরোটা বানায়। বসে আছ কেন? হাত-মুখ ধুতে যাও।

মুহিব খেতে বসেছে। লীলা বসেছে তার সামনে। এত আগ্রহ করে খাচ্ছে, লীলার চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম হলো। লীলা বলল, ডেভিড ব্রেইনের নাম শুনেছ?

না।

উনি একজন ম্যাজিশিয়ান। নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের পথে পথে তিনি ম্যাজিক দেখান। স্ট্রীট ম্যাজিশিয়ান। কী ম্যাজিক দেখান জানো?

কী ম্যাজিক?

শূন্যে ভাসার ম্যাজিক। তুমি শিখবে?

মুহিব বলল, না। আমি তো শূন্যে ভেসেই আছি।

তুমি যখন শূন্যে ভেসেই আছ, তোমার জন্যে সুবিধা হবে। আমি তোমাকে আহসান সাহেবের কাছে পাঠাব। তিনি তোমাকে শিখিয়ে দেবেন। আজ যেতে পারবে? রাত আটটার পর।

শূন্যে ভেসে থাকার ম্যাজিক শিখে কী করব?

মাঝে মাঝে আমার সামনে শূন্যে ভেসে থাকবে। আমি দেখে মজা পাব। যেতে পারবে? বলব উনাকে টেলিফোন করে?

বলো।

পরোটা কেমন হয়েছে?

খুব ভালো। দুটা পরোটা আর মাংস কি প্যাকেট করে দিতে পারবে?

কেন?

বাবার জন্যে নিয়ে যাব।

দিয়ে দেব। পরোটা মাংস ছাড়া আর কিছু কি লাগবে?

না। তারপরই মুহিব বলল, তোমাকে একটা কথা বলার জন্য এসেছি। বাবা এই নোংরা কাজটা করেন নি।

লীলা বলল, তুমি যখন বলছ করেন নি, তাহলে অবশ্যই করেন নি। তুমি কি এখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে?

হ্যাঁ।

রাত আটটায় আহসান সাহেবের কাছে যাবে, মনে আছে?

মনে আছে।

কাগজে ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। এক কাজ করি, তোমাকে গাড়ি দিয়ে দেই। ড্রাইভার তুমি যেখানে যাবে নিয়ে যাবে। দেই?

না।

লীলা বলল, তোমার হাত-পা কাঁপছে? কেন? জানি না কেন?

তোমার সঙ্গে গাড়িটা থাকুক প্লিজ। আরেকটা কথা শোন, মনে কর তোমার বাবা এই কাজটা করেছেন, তার জন্যে আমি কখনো, কোনোদিনও তোমাকে দায়ী করব না। Never ever.

মুহিব বলল, আমি সেটা জানি।

সত্যি জানো?

হ্যাঁ। আমি আমার জীবনে নিজের অজান্তেই কোনো একটা মহাপুণ্য করেছিলাম বলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

মহাপুণ্যটা কী তুমি জানো না?

না।

লীলা হাসতে হাসতে বলল, আমি কিন্তু জানি। তুমি আমাকে নর্দমা থেকে টেনে তুলেছ। এইটাই মহাপুণ্য।

আলাউদ্দিন মাংস-পরোটা খাচ্ছেন। তিনি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কোন রেস্টুরেন্ট থেকে এনেছিস?

মুহিব বলল, লীলা হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট।

ওয়ান্ডারফুল রান্না। পরোটা হয়েছে মাখনের মতো মোলায়েম। ঘি দিয়ে ভেজেছে মনে হয়, ঘিয়ের গন্ধ পাচ্ছি।

বাবা, আরাম করে খাও।

ওসি সাহেবের টাকাটা এনেছিস?

এনেছি।

পায়ে ধরার কথা মনে আছে তো?

মনে আছে।

বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে পায়ে ধরা যায়। দোষ হয় না।

তুমি কখনো কারো পায়ে ধরে বাবা?

না। হামিদুজ্জামান সাহেবকে টাকা দিয়েছিস? ঘাগু লইয়ার। কেইস পানি করে ছেড়ে দিবে।

মুহিব বলল, উনি শুরুতেই এক লাখ টাকা চান।

বলিস কী? সস্তা কাউকে খুঁজে বের করা দরকার। বদ মেয়েটার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিস?

না।

গাধার মতো কাজ করলে হবে মাথায় এত বড় বিপদ।

মুহিব বলল, তার বাবার সূত্রে টেলিফোনে কথা বলেছি। কোচিং সেন্টার থেকে উনার নাম্বার জোগাড় করেছিলাম।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, টেলিফোনে কথা চালাচালি কী জন্যে? সামনাসামনি কথা বলবি। না-কি আমার কারণে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়? ঐ লোক কী বলেছে?

উনি টাকা দিতে রাজি হয়ছেন।

রাজি হয়েছে?

হুঁ। উনি পাঁচ লাখ টাকা চান। পাঁচ লাখ দিলে মামলা তুলে নিবেন বলেছেন। তার বিজনেস খারাপ যাচ্ছে, এইজন্যে টাকাটা দরকার।

আলাউদ্দিন হতাশ গলায় বললেন, পাঁচ লাখ কই পাব?

মুহিব বলল, উনি টাকা নিলেন, তারপর মামলা তুললেন না?

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, আগেই কু ডাক ডাকা শুরু করলি? জায়গাটা বেচে দে। চার কাঠা জায়গা। পাঁচ ছয় লাখ পাওয়ার কথা।

আমরা থাকব কোথায় বাবা?

আমি জেল থেকে বের হই। একটা কিছু ব্যবস্থা করবই। জায়গা বেচে দে। দ্রুত ব্যবস্থা করা মামলা কোর্টে ওঠার আগেই ব্যবস্থা করা দরকার। তোর মা আছে কেমন?

ভালো?

আমার বিষয়ে কিছু বলে? বোকা মেয়েমানুষ। যা শুনবে সবই বিশ্বাসী করবে। ধরেই নিয়েছে আমি এই কাজ করেছি। ধরে থাপড়ানো দরকার।

মুহিব বলল, মা তো কিছুই বলছে না। শুধু শুধু তাঁকে থাপড়ানোর কথা কেন

বলছ?

কথার কথা বলছি। দুই প্যাকেট সিগারেট কিনে নিয়ে আয়। মশার কামড়ে রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় না। সারারাত জেগে থাকি আর সিগারেট খাই।

মুহিব উঠে দাঁড়াল। বাবার এখান থেকে সেযাবে আহসান সাহেব নামে এক লোকের কাছে। তিনি তাকে শূন্যে ভেসে থাকা শেখাবেন। তারপর সে কী করবে? বাসায় ফিরে যাবে? আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকা মা এবং বোনের সামনে বসে থাকবে। মোটেই ইচ্ছা করছে না। তারচেয়ে বরং নিলি ম্যাডামের কাছে যাওয়া যায়। তিনি নিশ্চয়ই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছেন জন্মদিনের উপহার পেয়ে ছেলে কী করেছে তা জানার জন্যে।

হয়তো নিলি ম্যাডাম বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। তখন সে রাস্তায় হাঁটবে। পুরোপুরি হিমু হয়ে যাবে। টহল পুলিশ যদি জিজ্ঞেস করে সে বলবে, আমি হিমু।

পুলিশ জিজ্ঞেস করবে, যাচ্ছেন কোথায়?

সে বলবে, জানি না। হিমুরা কোথায় যায় তারা জানে না।

নিলি ম্যাডামের গেটের দারোয়ান মুহিবকে চিনল। মুখভর্তি করে হাসল।

স্যার, ভালো আছেন?

মুহিব বলল, ভালো আছি।

যান ভেতরে চলে যান।

লেখাপড়া করতে হবে না?

দারোয়ান বলল, না, ম্যাডাম বলে দিয়েছেন আপনার ব্যাপারে কিছু লাগবে। চলে যান।

দরজা খুলে নিলি মোটেই অবাক হলো না। তার ভাব দেখে মনে হলো সে অপেক্ষা করছিল। নিলি বলল, আপনি নিশ্চয় কোনো সমস্যায় পড়েছেন। আপনাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে।

মুহিব বলল, সমস্যায় পড়ি নি। আপনাকে একটা জিনিস দেখাতে এসেছি। দেখিয়ে চলে যাব।

কী দেখাবেন?

সোফায় বসুন। দেখাচ্ছি। জিনিসটা দেখাবার জন্যে আমাকে একটা বিশেষ জায়গায় দাড়াতে হবে।

নিলি সোফায় বসেছে। তার চোখেমুখে একই সঙ্গে শঙ্কা এবং কৌতূহল।

মুহিব বলল, আপনার ড্রয়িংরুমে আলো বেশি। কিছু কমিয়ে দেই?

দিন।

মুহিব কয়েকটা বাতি নিভিয়ে নিলির সামনে দাঁড়াল। ক্লান্ত গলায় বলল, আপনি আমার দিকে তাকিয়ে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখবেন আমি শূন্যে ভাসছি।

নিলি বলল, পাগলের মতো এইসব কী বলছেন? আপনার কী হয়েছে? সমস্যাটা কী?

মুহিব বলল, এই দেখুন ভাসছি।

নিলি হতভম্ব গলায় বলল, আসলেই তো ভাসছেন! কী আশ্চর্য! কতক্ষণ ভেসে থাকতে পারেন?

বেশিক্ষণ পারি না।

মিলি বলল, এইসব কী দেখাচ্ছেন? আমি জীবনে এত অবাক হই নি। নেমে পড়ুন। দেখে মনে হচ্ছে আপনার কষ্ট হচ্ছে। আসলেই শূন্যে ভেসেছেন, নাকি এটা কোনো Tricks?

মুহিব শূন্য থেকে নামল। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, ম্যাডাম যাই? অনেক রাতে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না।

নিলি বলল, যাবেন মানে? আপনি আমার সঙ্গে ডিনার করবেন। আমি কয়েকবার আপনাকে টেলিফোন করেছি। আপনি টেলিফোন ধরেন নি, লাইন কেটে দিয়েছেন। গতকাল আপনার শুটিং ছিল, আপনি আসেন নি। কী হয়েছে আপনার জানতে পারি?

আমার কিছু হয় নি ম্যাডাম। আমি ভালো আছি।

আপনার বান্ধবী রূপা।–সে কি ভালো আছে?

ওর নাম লীলা।

লীলা ভালো আছে?

মুহিব বলল, লীলা ভালো আছে। ওর দুই ময়ূর চিত্রা এবং মিত্রা ভালো আছে। শুধু তার বাঁদরটার শরীর খারাপ করেছে। কাশি হয়েছে। মানুষের মতো খক খক করে কাশছে। লীলার বাবা শওকত সাহেব কলার ভেতর হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দানা ভরে তাকে খেতে দিচ্ছেন। তার চিকিৎসা চলছে।

নিলি বলল, মুহিব, আপনি বসুন তো। কথা না বলে চুপ করে বসুন। আমি যা জিজ্ঞেস করব শুধু তার জবাব দেবেন! Something is very Wrong. I can feel it. টেবিলে খাবার দেয়া হোক। এর মধ্যে আমরা গল্পগুজব করি। আপনাকে পেয়ে ভালো লাগছে। আমি একা খেতে পারি না। সব পশু একা খেতে পছন্দ করে, শুধু মানুষ এবং পাখি এই দুই শ্রেণী একা খেতে চায় না।

মুহিব বলল, এটা আমি জানতাম না। পাখিদের বিষয়ে শুধু একটা বিষয় জানি। লীলার বাবা বলেছেন, পাখিরা আগে সরীসৃপ ছিল পরে পাখি হয়েছে।

নিলি বলল, এই তথ্য আবার আমি জানি না। ভালোই হয়েছে, exchange of ideas. এখন বলুন, আপনি কি কোনো বিপদে পড়েছেন?

মুহিব বলল, আমি বিপদে পড়ি নি। আমার বাবা বিপদে পড়েছেন। মহাবিপদে। তিনি এখন থানা হাজতে ঘাপটি মেরে বসে আছেন। আপনাকে যেমন মশা কামড়ায়, বাবাকেও কামড়াচ্ছে।

নিলি বলল, আমি কি কোনো সাহায্য করতে পারি? অবশ্য আমার তেমন কানেকশন নেই। পদ্মর বাবার অনেক কানেকশন। সে যেমন মানুষকে বিপদে ফেলতে পারে, আবার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে। আমি একটা কথা বললে সে ফেলবে না।

মুহিব বলল, ম্যাডাম! আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

নিলি বলল, পদ্মর বাবা টেলিফোনে আপনার প্রশংসা করছিল। আপনি নাকি সজিরনকে ধমকাধমকি করে এসেছেন। ও বলছিল, যে ছেলে খাচায় ঢুকে বাঘকে খোচা দেয়ার সাহস রাখে, সেই ছেলের সাহসের তারিফ করতে হয়। আপনি চাইলেই সে আপনাকে ভালো একটা চাকরি দিয়ে দেবে। তাকে বলব?

না।

না কেন?

ম্যাডাম, আমি দুষ্ট লোকের চাকরি করি না। আমি হিমু হতে চাচ্ছি। হিমুরা দুষ্ট লোকের অধীনে কাজ করে না।

আমি কোনো চাকরি দিলে করবেন? আমি ম্যানেজার জাতীয় একজনকে খুঁজছিলাম।

ম্যাডাম, আপনার চাকরিও করব না।

আমি তো দুষ্ট লোক না। আমার চাকরি কেন করবেন না?

মুহিব বলল, এখন আপনি আমাকে দেখছেন খানিকটা বন্ধুর মতো। আমাকে নিয়ে টেবিলে খেতে বসছেন। আপনার চাকরি নেবার পরপর আপনি আমাকে দেখবেন বেতনভুক্ত কর্মচারীর মতো। আমাকে এক টেবিলে নিয়ে খেতে বসবেন। আমি যদি অভিনয় করি, আমার বিপরীতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন।

নিলি বলল, খাওয়া দেয়া হয়েছে। খেতে আসুন। আর যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার বাবা কী সমস্যায় পড়েছেন সেটা বলুন।

মুহিব বলল, আমার বাবা একটা মেয়েকে রেপ করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। এখন হাজতে আছেন।

এই নিউজটাই কি পত্রিকায় এসেছে?

জি। ম্যাডাম, আমি কিছু খাব না। আমার মা এবং বোন সারাদিন আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে। তাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। তারা নিশ্চয়ই না খেয়ে আছে। ম্যাডাম, যাই! আপনার ছেলেটাকে দেখে এত ভালো লেগেছিল। কী মিষ্টি যে তার কথা! বলে কী— গোলাপ ফুল আমাকে গোঁতা দিয়েছে।

মুহিব বাসায় ফিরল না। রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে থাকল। প্রথম উপস্থিত হলো আলাউদ্দিন কোচিং সেন্টারে। সাইনবোর্ড এখনো আছে। সাইনবোর্ড নামানো হয় নি। কাল-পরশুর মধ্যে নিশ্চয়ই নামিয়ে ফেলবে। কোচিং সেন্টারের চারদিকে তিনবার চক্কর দিল। সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে গেল লীলাদের বাড়িতে। পুরো বাড়ি অন্ধকার, শুধু লীলার ঘরে বাতি জ্বলছে। অর্থাৎ লীলা জেগে আছে। মুহিব ঠিক করল, লীলার ঘরের বাতি না নেভা পর্যন্ত সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে। বাতির দিকে তাকিয়ে থাকবে। কিছু না, একটা খেলা। অতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তার সময় ছেলেমানুষী খেলা খেলতে ভালো লাগে।

মুহিব বাসায় ফিরল রাত তিনটায়। তার মা এবং অশ্রু দুজনই না খেয়ে অপেক্ষা করছে। ভয়ে এবং দুঃশ্চিন্তায় দুজনই অস্থির।

রাজিয়া বেগম বললেন, কোথায় ছিলিরে বাবা?

মুহিব বলল, রাস্তায় হাঁটছিলাম। গরম পানির ব্যবস্থা কর তো মা, গোসল করব। তোমরা খাওয়াদাওয়া করেছ?

না।

ঘরে রান্না কী?

রান্না হয় নাই। ডিম ভাজি করে দেই?

দাও।

তোর বাবার অবস্থা কী?

মুহিব বলল, বাবার আলাপ এখন থাকুক। বাবা ভালো আছেন। সিগারেট খাওয়া ধরেছেন। একজন হাজতি পাওয়া গেছে যে সিগারেটের বিনিময়ে বাবার পা টিপে দিচ্ছে।

রাজিয়া বললেন, আমাকে নিয়ে যাবি? দেখা করতাম।

দেখা করে কী বলবে?

রাজিয়া জবাব দিলেন না। গরম পানির ব্যবস্থা করতে গেলেন। অশ্রু ভাইয়ের পাশে বসে রইল।

মুহিব বলল, তোর ভূতটার খবর কী? এখনো খাটের নিচে বসে থাকে?

অশ্রু বলল, বাবার ঐ ঝামেলার পর ভূতটাকে দেখছি না।

মুহিব বলল, বাবার ঘটনায় তুই বিশাল এক ধাক্কার মতো খেয়েছিস। সেই ধাক্কা ভূত বাবাজির গায়েও লেগেছে, ভূত পালিয়েছে। আমার মনে হয় না তুই এই ভূত আর দেখবি। সব মন্দের একটা ভালো দিক আছে।

অশ্রু বলল, ভাইয়া, তোমার গা থেকে বিকট সিগারেটের গন্ধ আসছে।

মুহিব বলল, একটার পর একটা সস্তী সিগারেট খেয়ে যাচ্ছি। গন্ধ তো আসবেই। এখন একটা ধরাব। পানি গরম না হওয়া পর্যন্ত সিগারেট ব্রেক।

মুহিব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, শূন্যে ভাসা খেলা দেখবি?

শূন্যে ভাসা খেলা কী?

মুহিব বলল, আমি তোর চোখের সামনে শূন্যে ভেসে থাকব।

অশ্রু বলল, ভাইয়া, আমার মনে হয় তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

মুহিব বলল, সম্ভাবনা আছে। ইচ্ছা করছে সারাক্ষণ শুন্যে ভেসে থাকি।

৫. আবার পত্রিকার প্রথম পাতায়

আলাউদ্দিন আবার পত্রিকার প্রথম পাতায় চলে এসেছেন। পুলিশ তাকে তিনদিনের রিমান্ডে নিয়েছিল। রিমান্ডে তিনি সব স্বীকার করেছেন। পত্রিকার খবরের শিরোনাম–

ধর্ষক শিক্ষকের অপরাধ স্বীকার
ঘটনার রগরগে বর্ণনা

খবরের কাগজের প্রতিবেদক লিখছেন— ধর্ষক আলাউদ্দিন ছাত্রীকে নিজের খাসকামরায় ডেকে আনেন। ছাত্রীর লেখা রচনায় ইংরেজি বানানের ভুলগুলি ধরিয়ে দেবার জন্যে। এক পর্যায়ে তাকে বলেন— বাইরে হৈচৈ হচ্ছে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসো। সরল মনে ছাত্রী তাই করে। কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি উঠে পড়েন এবং বলেন— দরজা পুরোপুরি না বন্ধ করলে শব্দ যাবে না। এই বলে নিজেই দরজার ছিটিকিনি লাগিয়ে দেন এবং ছাত্রীর সামনে এসে বসতে বসতে বলেন, তোমাকে আমার খুবই ভালো লাগে। কিন্তু আমার পক্ষে তোমাকে বিবাহ করা সম্ভব না। ঘরে আমার বড় বড় ছেলেমেয়ে আছে। এখন তোমার কাছে বৃদ্ধের একটা আবদার...

এই পর্যন্ত পড়ে মুহিব কাগজ ভাঁজ করে একপাশে রাখল। সে বসেছে আমানুল্লাহ টি স্টলে। নিলি ম্যামের বাড়ির কাছে টি স্টল। প্রায়ই সে এখানে চা খেতে আসে। তার সঙ্গে বড় লাল রঙের ফ্লাস্ক। আজ সারাদিনে তার অনেক কর্মকাণ্ড আছে। একেকটা কাজ শেষ করবে আর এক কাপ করে চা খাবে। প্রথম যাবে আলাউদ্দিন কোচিং সেন্টারে। কোচিং

সেন্টারের বর্তমান প্রধান আবু হিশাম তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। জরুরি কী কথা না-কি আছে।

মুহিবের পাশে বসা কাস্টমার বলল, ব্রাদার, কাগজটা কি পড়া হয়েছে?

হ্যাঁ।

ইন্টারেস্টিং কিছু আছে?

ধর্ষণ নিউজ আছে। পড়লে মজা পেতে পারেন। মুহিব কাগজ এগিয়ে দিল। তার দুকাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে। এখন উঠে যাবার সময় হয়েছে। উঠতে ইচ্ছা করছে না। আবার বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। গত পাঁচদিন তার বাবার সঙ্গে মুহিবের দেখা হয় নি। ওসি সাহেব বলেছেন আজ দেখা করা যাবে। আজকের পর দেখা করা সমস্যা হবে। তাকে থানা-হাজত থেকে জেল-হাজতে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

মুহিব আরেক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। তার পাশে বসা লোক গভীর আগ্রহে আলাউদ্দিনের স্বীকারোক্তি পড়ছে। মুহিব তাকিয়ে আছে লোকটির দিকে এবং চিন্তা করছে বাবাকে নিয়ে তার নিজের আনন্দের কোনো স্মৃতি আছে কি-না। তেমন কিছু মনে পড়ছে না। কোনো না কোনো স্মৃতি নিশ্চয়ই আছে। মাথা Blank হয়ে গেছে। অশ্রুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মেয়েরা সুখের স্মৃতি দুঃখের স্মৃতি সবই মনে করে রাখে। কিছুই ভোলে না।

ব্রাদার! বুভার কারবার পড়েছেন?

হুঁ।

আরে তোর এই অবস্থা—তুই বেশ্যাবাড়ি যা, চন্দ্রিমা উদ্যানে যা। দিনেদুপুরে ছাত্র-ছাত্রীর সামনে দরজা বন্ধ করে এইসব কী? এদের কী করা উচিত জানেন? স্টেডিয়ামে সবার সামনে গুলি করা উচিত। ফায়ারিং স্কোয়াড।

মুহিব ফ্লাস্ক হাতে উঠে পড়ল। ফায়ারিং স্কোয়াড-বিষয়ক আলোচনায় অংশ

নিল না।

আবু হিশাম অফিসেই ছিলেন। মুহিবকে দেখে গম্ভীর গলায় বললেন, আজকের কাগজ পড়েছ?

আজ বুধবার। মিথ্যাদিবস। কাজেই মুহিব বলল, না।

না পড়ে ভালোই করেছ। তোমার বাবা অতি নোংরা কথাবার্তা নিজের মুখে স্বীকার করেছে। মানুষটা যে বিকারগ্রস্ত আগে বুঝতে পারি নাই। কঠিন বিকার ছাড়া এই ধরনের কথাবার্তা বলাও সম্ভব না। নিজের অপমান। তার ঘনিষ্ঠজনের অপমান। বন্ধুবান্ধবদের অপমান।

মুহিব বলল, জরুরি কী কথা বলার জন্যে না-কি খবর দিয়েছেন?

শুনলাম জমিটা বিক্রি করার চেষ্টা করছ। দালাল লাগিয়েছ?

জি চাচা।

জমি বেচলে তোমরা থাকবে কোথায়?

মার এক ছোটভাই আছেন, বাড্ডায় থাকেন। মোটর মেকানিক। মাকে আর অশ্রুকে ঐ বাড়িতে পাঠিয়ে দিব।

আর তুমি? তুমি কোথায় থাকবে?

আমার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করি নাই চাচা। সব চিন্তা একটার পর একটা করতে হয়। একসঙ্গে তিন-চারটা চিন্তা করা যায় না।

জমির দাম কত চাও?

বাজারে যে দর আছে তাই চাই। সেটা পাব বলে মনে হয় না।

খদ্দের পাওয়া গেছে?

একজন পেয়েছি, সাত লাখ দিতে চায়। বলেছে রাজি হলে আগামীকাল বায়না করবে (এটা মিথ্যা। একজন পাওয়া গেছে ঠিকই, তবে সে চার লাখ দাম বলছে। বুধবার হবার কারণে অনায়াসে মিথ্যা বলতে পারছে।)

মুহিব! এই জমিটা নিয়ে আমার কিছু কথা আছে।

জি চাচা বলুন।

তোমার বাবা এবং আমি দুজনে মিলে ঠিক করি জমিটা কিনব। বায়নার টাকা অর্ধেক আমার দেয়া। বিশ্বাস না হলে তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। যাই হোক, তোমার পিতা ছিলেন অতি ধান্ধাবাজ লোক। জমি কিনলেন তার নামে। পুরনো প্রসঙ্গ তুলে লাভ নাই। জমিটা আমি কিনব। তবে পাঁচ লাখ টাকার বেশি একটা কানা পয়সাও পাবে না।

মুহিব বলল, ইচ্ছা করলেও কানা পয়সা দিতে পারবেন না চাচা। কানা পয়সা বলে কিছু বাজারে নাই।

তোমার সঙ্গে রসিকতা করার সময় আমার নাই। পাঁচ লাখে দিবে?

জি দিব। যদি টাকাটা আজকালের মধ্যে পাই।

টাকা আগামীকাল দিব। জানি তোমার টাকাটা ইমিডিয়েট দরকার। এখন বায়না বাবদ কিছু নিয়ে যাও।

তিনি ড্রয়ার খুলে পঁচিশ টাকার একটা বান্ডেল বের করলেন। একটা স্ট্যাম্প পেপার বের করলেন, সেখানে আগেই টাইপ করে লেখা— বায়না বাবদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম। ইত্যাদি। মুহিবকে স্বীকার করতে হলো, হিশাম নামের মানুষটা কাজেকর্মে যথেষ্ট গোছানো।

মুহিব বলল, চাচা, চা খাবেন?

চা?

জি চা। খুব ভালো চা, আফিং দেয়া। এককাপ খেলে আরেক কাপ খেতে ইচ্ছা করবে।

হিশাম সাহেব চোখ সরু করে তাকিয়ে আছেন। মুহিব ফ্লাস্ক খুলে ফ্লাস্কের মুখে চা ঢালছে। হিশাম সাহেব না খেলে সে নিজেই খাবে।

হিশাম বললেন, আমি চা পান করি না।

মুহিব বলল, চাচা, অনুমতি দিলে আমি পান করে ফেলি? তারপর ফ্রাঙ্ক নিয়ে বাবার কাছে যাব। বাবাকে পান করাব।

আলাউদ্দিন উবু হয়ে বসে চুক চুক করে চা খাচ্ছেন। তার গায়ে হাতাকাটা গেঞ্জি। পরনে লুঙ্গি। লুঙ্গি সামান্য উঁচু হয়ে আছে বলে কাঠি কাঠি পা দেখা যাচ্ছে। তাকে এখন মোটামুটি একজন ভিখেরির মতোই লাগছে। চোখের চশমাটা শুধু পোশাকের সঙ্গে যাচ্ছে না। চশমার বা-দিকের কাচটা ভেঙে তিন টুকরা হয়ে ফ্রেমের সঙ্গে ঝুলে রয়েছে।

মুহিব বলল, চশমা ভাঙল কীভাবে?

আলাউদ্দিন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন, ভালো চা বানিয়েছে। তোর মা যে চা বানায় মুখে দেয়া যায় না। মনে হয় ঘোড়ার পিলাব। জীবন পার করে দিয়েছি ঘোড়ার পিসাব খেয়ে।

মুহিব বলল, জায়গা বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে। হিশাম চাচা কিনবেন।

কিনুক। বদের বাচ্চা।

হিশাম চাচা বলছিল, তোমরা দুজন মিলে একসঙ্গে জমিটা কিনতে চেয়েছিলে। বায়নার টাকার অর্ধেক তুমি দিয়েছিলে, অর্ধেক উনি দিয়েছেন।

বদটার কোনো কথা বিশ্বাস করবি না। বায়নার সময় কিছু টাকা ধার করেছিলাম, পরে শোধ দিয়েছি। বাদ দে এইসব কথা। জমি বিক্রির পর তোর মা-বোন কোথায় যাবে কিছু ভেবেছিস?

বাড়ায় সালাম মামার কাছে পাঠিয়ে দেব। সালাম মামা মাকে পছন্দ করেন। প্রতি ঈদে শাড়ি পাঠান।

বুদ্ধি খারাপ না। সালামটা বেকুব টাইপ। বোনকে রাস্তায় ফেলবে না। কিছুদিন অবশ্যই রাখবে। এর মধ্যে আমি বের হয়ে ব্যবস্থা করে ফেলব।

কী ব্যবস্থা করবে?

কোচিং সেন্টার দেব। আর কী করব? যে জুতা সেলাই করে সে সারাজীবন জুতা সেলাই করে, অন্যকিছু করতে পারে না। মেয়েটাকে পাঁচ লাখ টাকা কবে দিবি কিছু ঠিক করেছিস?

মুহিব বলল, টাকা হাতে পেলেই দিব।

তিন-চারের মধ্যে রক্ষা করা যায় কি-না দেখবি। টাকা দেয়ার সময় চোখের পানি ফেলে রিকোয়েস্ট করবি? পুরো বিষয়টাই যে সাজানো এটা তুই জানিস না এইরকম ভাব করবি।

আচ্ছা।

রিমান্ডে পুলিশের মার খেয়ে অনেক কিছু বলেছি। এটা আমি যেমন জানি ঐ মেয়েও জানে। কোনো একদিন মেয়েটা স্বীকার করবে।

আলাউদিনের চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। মুহিব বলল, আরেক কাপ চা খাও। একটা সিগারেট ধরাও চা দিব বাবা?

দে।

চশমাটা দিও, কাচ ঠিক করে ফেরত দিয়ে যাব।

আলাউদ্দিন কিছু না বলে চশমা খুলে ছেলের হাতে দিলেন। মুহিব বলল, আমার সঙ্গে টাকা আছে। হিশাম চাচা দিয়েছেন। পঞ্চাশ হাজার। তোমার হাতে কিছু টাকা দিব?

টাকা সঙ্গে সামান্য আছে। লাগবে না। হাজত জায়গা খারাপ। টাকা চুরি লেগেই আছে।

রাতে ঘুম হয়?

না। তবে অসুবিধা হয় না। দিনে ঘুমাই।

কোনো গানটান এর মধ্যে মাথায় এসেছে? একটা নোটখাতা আর কলম কিনে দেই? মাথায় কিছু এলে লিখে ফেলবে। অনেকদিন গান লেখ না।

আলাউদ্দিন হেসে ফেললেন। মুহিব বলল, বাবা, আমি উঠি? তোমার আর কিছু বলার থাকলে বলো।

আলাউদ্দিন বললেন, একটা কথা বলার আছে। সারাজীবন তোকে গাধা বলেছি। অর্ধমানব বলেছি। হাজতে এসে বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পুণ্য তোর মতো গাধামানবের জন্ম দেয়া।

আলাউদ্দিন আবার কাঁদতে শুরু করলেন। মুহিব বলল, বাবা, চায়ে চুমুক দাও।

আলাউদ্দিন কাঁদতে কাঁদতেই চায়ে চুমুক দিয়ে বিষম খেলেন। মুহিব বাবার পিঠে হাত রাখল। আলাউদ্দিন নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ছোট্ট ভুল কথা বললাম, হাজতে ঢুকে বুঝেছি এটা ঠিক না। তুই যে রাতে কোলে করে তোর মাকে ঘরে নিয়ে গেলি সেদিনই বুঝেছি।

মুহিব উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বুঝলে বুঝেছ। বাবা, আমি এখন যাচ্ছি।

বাসায় যাবি?

কিছু কাজ আছে। কাজ সেরে বাসায় যাব।

তোর বড় দুই বোন রেশমা, শিউলি, এরা কোনো খোঁজখবর করেছে?

রেশমা আপু কুরিয়ারে একটা চিঠি পাঠিয়েছে।

সঙ্গে আছে?

আছে। তোমার না পড়াই ভালো।

আলাউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, সিচুয়েশন বুঝতে হলে ভালো-মন্দ সব কিছুই জানা দরকার। একচক্ষু হরিণের মতো হলে চলবে না। শুধু ভালো দেখব, মন্দ দেখব না।

মুহিব চিঠি রেখে চলে গেল।

চিঠি মুহিবকে লেখা—

প্রিয় খোকন (মুহিবকে রেশমা খোকন ডাকে),

কুত্তা বাপের কারণে আজ আমি অকূলপাথারে। দিনরাত তোর দুলাভাইয়ের কথা শুনতে হচ্ছে! সেদিন গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছে। আগে এই সাহস ছিল না। লোক জানাজানির আগে তুই কুত্তা বাপটার গলা টিপে মেরে ফেলতে পারলি না?...

আলাউদ্দিন দীর্ঘ চিঠি দুবার পড়ে বললেন, ভেরি স্যাড। দশটা বানান ভুল।

আজ সকাল থেকেই লীলা ছাদে। আহসান ট্রাকভর্তি গাছপালা নিয়ে এসেছে। ছাদে বাগান হবে। একজন মালি এসেছে। রাজমিস্ত্রি এসেছে। সিঙ্গাপুর থেকে কিছু মূর্তিও আনা হয়েছে। পরীর মূর্তি। মূর্তিগুলি গাছপালার ফাকে ফাকে বসানো হবে। আহসান বলল, লীলা, তুমি তোমার ঘরে থাক। আমি ছাদটা গোছাই, তারপর ছাদে এসে দেখে চমকাবে।

লীলা বলল, আমিও আপনার সঙ্গে গোছাব। সব রেডি হয়ে গেলে মুহিবকে আসতে বলব। সে চমকাবে।

আহসান বলল, সব নদী যেমন সাগরে পড়ে, তোমার সব কথাবার্তা মুহিবে শেষ হয়।

লীলা বলল, আমি নিজে চমকাতে পছন্দ করি না, তবে মুহিবকে চমকাতে পছন্দ করি।

আহসান বলল, মুহিবের বাবা যে ধর্ষণ মামলায় জেলে আছেন এই খবর জানো?

আপনাকে কে বলেছে? মুহিব?

হ্যাঁ। মুহিবের এই গুণটি দেখলাম, তার মধ্যে লুকোছাপা নেই। সত্যি কথা বলে।

লীলা বলল, বুধবারে সে সত্যি বলে না। বুধবার হচ্ছে তার মিথ্যাদিবস। ঐদিন সে মিথ্যা বলবে।

তোমার কাছেও?

হ্যাঁ, আমার কাছেও।

এর কারণ কী জানো?

লীলা বলল, জানি না। জানতে চাইও নি।

আহসান বলল, আমার ধারণা আমি কারণটা জানি। নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত যুবকদের নিজেকে বিশেষভাবে প্রকাশ করার তেমন সুবিধা নেই। সে ব্র্যান্ডের শার্ট কিনতে পারবে না। নতুন মডেলের গাড়ি কিনতে পারবে না। ইচ্ছা করলেই বান্ধবীকে নিয়ে দামি কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে যেতে পারবে না। তাকে খুঁজে বের করতে হয় তার আয়ত্ত আছে এমন কিছু। যেমন— মিথ্যাদিবস, কথা বন্ধ দিবস, এইসব। আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে একদিন শুনবে, সে শনি বা রবিবারকে ডিক্লেয়ার করেছে কথা না-বলা দিবস। সেদিন সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। কিন্তু কথা বলবে না। তুমি প্রশ্ন করলে লিখে উত্তর দিবে।

লীলা বলল, আপনার observation সত্যি হতেও পারে।

আহসান বলল, তোমার মিথ্যাদিবস বান্ধব কিন্তু শুন্যে ভাসার ম্যাজিকটা অতি দ্রুত শিখেছে এবং ভালো শিখেছে। আমি নিজেই অবাক হয়েছি।

সে যে কাজই করে খুব মন দিয়ে করে। একটা পর্যায় পর্যন্ত করে, তারপর থেমে যায়। পরিস্থিতি তাকে থামিয়ে দেয়।

আহসান বলল, আমাকে একটা কথা বলো তো। মুহিবের বিষয়ে তোমার পরিকল্পনা কী? তাকে বিয়ে করবে? না সে হবে তোমার দুই ময়ূর মিত্রা এবং চিত্রার মতো পোষা বন্ধু। বাঁদরটার কথা বললাম না। বাঁদরের কথা বললে তুমি আহত হবে এই সম্ভাবনা আছে।

লীলা বলল, মনে করুন আপনি আহসান না। আপনি লীলা। আপনি হলে কী করতেন? আপনার honest মতামত কী?

আহসান বলল, তোমার মেন্টাল মেকাপের কাছাকাছি যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। মেয়েদের মেন্টাল মেকাপের কমপ্লেক্সিটি আমার জানাও নেই। কাজেই মতামত দিতে পারছি না। শুধু একটা জিনিস বলতে পারছি, মুহিবের প্রতি তোমার প্রেম নেই।

প্রেম নেই?

না। তুমি তার কর্মকাণ্ড দেখে খুশি হও, আবার তোমার পোষা জীবজন্তুর কর্মকাণ্ড দেখেও খুশি হও। তাকে তুমি আশেপাশে অবশ্যই রাখতে চাও। তার শূন্যে ভাসা দেখে মজা পাবার জন্যে বা অন্যান্য কাজকর্মে মজা পাবার জন্যে। এর বেশি কিছু না। সত্যি যদি তার

প্রেমে পড়তে, তাহলে তার এতবড় দুঃসময়ে তুমি তার পাশে থাকতে। তুমি কিন্তু পাশে নেই।

লীলা বলল, তার পাশে থাকা মানে তাকে লজ্জা দেয়া। এই লজ্জাটা তাকে দিতে চাচ্ছি না।

আহসান বলল, শুধু লজ্জা দেয়া না। লজ্জা পাওয়াও। তুমি লজ্জাটাও পেতে চাচ্ছ না। আচ্ছা লীলা, তুমি কখনো তার বাসায় গিয়েছ? তার মা, বোন, এদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

না।

কোনো মেয়ে যদি সত্যি সত্যি কোনো ছেলের প্রেমে পড়ে, সে তখন এই ছেলের আশেপাশের সবকিছুর প্রেমে পড়ে।

লীলা তাকিয়ে আছে। সে এইভাবে কখনো চিন্তা করে নি। আহসান বলল, তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি সামান্য মন খারাপ করেছ। দাড়াও, মন ভালো করে দেই। মুহিব ছেলেটা কিন্তু তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসে! আমি কাল রাতে বিষয়টা টের পেয়েছি।

কীভাবে টের পেয়েছেন?

শূন্যে ভাসা ম্যাজিক শিখে আমার ঘর থেকে সে যখন বের হলো আমি তার পেছনে একজন লোক লাগিয়ে দিলাম। তার দায়িত্ব হচ্ছে মুহিবকে ফলো করা।

এটা কেন করলেন?

তোমার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে করলাম। তুমি মুহিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশছ। মুহিব ছেলেটা কেমন জানা দরকার। মুহিব কী করল জানো?

কী করল?

অনেক কিছুই করল। হাঁটাহাঁটি। চায়ের দোকানে চা খাওয়া। একটা পর্যায়ে সে এসে তোমাদের বাসার সামনে দাঁড়াল। তখন রাত বারোটা দশ। তোমার ঘরে বাতি জ্বলছিল। সে তাকিয়ে ছিল বাতির দিকে। যখন বাতি নিভল সে চলে গেল। প্রায় দুঘণ্টা ছিল।

লীলা বলল, যে স্পাই লাগিয়ে ছিলেন সে এত Detail মনে রেখেছে?

আহসান বলল, স্পাইটা আমি নিজে। একটা কালো চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হয়েছিলাম। মুহিব লক্ষ করে নি। তার অবশ্য চারদিক লক্ষ করার মতো মানসিক অবস্থাও ছিল না।

লীলা বলল, খেতে আস। আমার ক্ষিধে লেগেছে। আজ সকাল সকাল খেয়ে নেব।

আহসান বলল, তুমি বলা শুরু করেছ?

লীলা বলল, হ্যাঁ।

সর্বনাশ! সামনের মাসে পনেরো দিনের জন্যে জাপান যাবার কথা। ফিরে এলে আবার আপনি?

জাপান যেও না।

আহসান বলল, আমাকে যেতেই হবে, উপায় নেই। একটা কাজ অবশ্য করা যায়। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়। যাবে?

লীলা চুপ করে আছে। পরী মূর্তি ছাদে বসানো হচ্ছে। তার দৃষ্টি সেদিকে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে মূর্তিটা! এত জীবন্ত!

আহসান বলল, আজ আমার জন্মদিন। লীলা, শুভ জন্মদিন বলবে না?

শুভ জন্মদিন।

থ্যাংক য়্যু। আমি ঠিক করে রেখেছিলাম, ছাদটা পুরোপুরি গোছানো হলে তোমাকে ছাদে এনে আমার জন্মদিনের কথা তোমাকে বলব। সরি, আগেভাগে বলে ফেলেছি।

চল খেতে যাই।

আহসান বলল, খাওয়ার পর ভ্রমণে বের হলে কেমন হয়? দুজন কিছুক্ষণ হাঁটলাম। একসময় ধাক্কা দিয়ে তোমাকে বড় কোনো নর্দমায় ফেলে দিলাম, তারপর টেনে তুললাম। তখন আর আমি পিছিয়ে থাকব না। মুহিবের কাছাকাছি চলে আসব।

লীলা হাসল।

মুহিব বলল, তোমার মেয়েটা আজ কী বেঁধেছে?

জানি না। অনেক আইটেম নিশ্চয়ই করেছে। সে অল্প আইটেম রাঁধতে পারে। না।

তুমি কি জানো আসমা কুয়েতের ঐ শেখের কাছে ফিরে যাচ্ছে?

তাই না-কি?

হ্যাঁ, কুয়েতের বদ শেখটা আসমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। সে জানিয়েছে আসমার কথা তার খুব মনে পড়ে। প্রায়ই তাকে স্বপ্নে দেখে। আসমা এতেই খুশি। সে এখন ফিরে যাবার জন্যে তৈরি। মেয়েরা কত অল্পতে খুশি হয় দেখেছ?

৬. ক্রিমিনাল লইয়ার হামিদুজ্জামানের চেম্বারে

ক্রিমিনাল লইয়ার হামিদুজ্জামানের চেম্বারে মুহিব বসে আছে। তার কাছে আসার কোনো ইচ্ছা মুহিবের ছিল না। নিলি ম্যাডাম তাকে পাঠিয়েছেন। যদি কেউ কিছু করতে পারে হামিদুজ্জামানই পারবে। হামিদুজ্জামানকে পঞ্চাশ হাজার টাকা আপাতত দেয়া হয়েছে। হামিদুজ্জামান বললেন, উকিল আর ডাক্তার এদের কাছে কিছু গোপন করবে না। গোপন করলে নিজেদেরই সমস্যা। বলো দেখি তোমার

কাছে এখন ক্যাশ টাকা কত আছে? মুহিব বলল, পাঁচ লাখের সামান্য বেশি। উত্তরখানের জমি বিক্রি করেছি। টাকা দিয়ে মামলা মিটমাট করব এইজন্যে। মেয়ের বাবা আশরাফ সাহেব পাচ লাখ টাকার বিনিময়ে মামলা তুলে নিবেন বলেছেন।

হামিদুজ্জামান বললেন, মুখে মামলা তুলে নিলাম বললে তো হবে না। মেয়েকে এবং মেয়ের বাবাকে কোর্টে এসে বলতে হবে মামলা মিথ্যা। তারপর তারা ফেঁসে যাবে। মিথ্যা মামলা করার জন্যে জেলে ঢুকতে হবে। বুঝেছু ঘটনা?

বুঝার চেষ্টা করছি।

জমি কার কাছে বিক্রি করেছ?

হিশাম চাচার কাছে। উনি বাবার বিজনেস পার্টনার। বাবার বিজনেস নিয়ে নেয়ার জন্যে মামলা উনি করিয়েছেন। সালমা মেয়েটা তার ভাগ্নি। দূরসম্পর্কের ভাগ্নি।

জমির দখল ছেড়ে দিয়েছ?

জি-না। আমার মা এবং অশ্রু এখনো উত্তরখানের বাড়িতে আছেন। হিশাম চাচা সাতদিন সময় দিয়েছেন। আমাদের যাওয়ার কোনো জায়গা নাই।

দখল ছাড়বা না। কোনোভাবেই না। আমরা উল্টা মামলা করব— জোর জবরদস্তি করে জমির দলিল করে নিয়েছে। বাঘ তখন ধান খাবে। দবিরকে পাঠাব। দবির এক ফাঁকে হিশাম আর মেয়ের বাপ— এই দুইটাকে ডলা দিয়ে আসবে।

দবির কে?

আছে একজন। তার সঙ্গে তোমার পরিচয় মা হওয়াই ভালো। আমি ক্রিমিনাল লইয়ার। কিছু ক্রিমিনাল আমার পোষা থাকবে না। এখন আমাদের একটা কাজ করতে হবে। জমির বায়না যে তারিখে হয়েছে, তার আগের কোনো তারিখে থানায় জিডি এর ব্যবস্থা নিতে হবে। সেখানে থাকবে হিশাম তোমাকে ভয়-ভীতি দেখাচ্ছে।

মুহিব বলল, ব্যাক ডেটে জিডি এন্ট্রি কীভাবে হবে।

হামিদুজ্জামান বিরক্ত মুখে বললেন, সেটা তো তোমার দেখার বিষয় না। আমার দেখার বিষয়। বুঝেছ কিছু?

বুঝার চেষ্টা করছি।

পত্রিকায় আমার পোষী লোক আছে।ক্রয়/তোমার বাবাকে নিয়ে একটা ফিচার। লিখবো।

কী ফিচার লিখবে?

লিখবে—একজনু সুম্মানিত শিক্ষক এবং এ দেশের প্রথম সারির গীতিকার ষড়যন্ত্রের শিকার। মিথ্যা অপবাদে তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে এবং তার বিষয়ছপত্তি ইতিমধ্যেইদলিল রেজিঞ্জি করে নিয়ে নেয়া হয়েছেদলিলের কপি ছেপে দেয়া হবে। এইখানেই শেষ না আরো বাকি আছে।

আর কী বাকি?

মেয়েটার নাম কী সালমান জি।

আমরা প্রমাণ করব আলম অতিদুষ্ট উইল ড্রাগ অ্যাভিষ্ট এক তরুণী। অসামাজিক কার্যকলাগালিভার কিছুছবি আমরা যোগাড় করব। নেংটা পুংটা ছবি প্রয়োজনে সস্তা কিছু ম্যাগাজিনে ছেপে দিব।

ছবি কোথায় পাবেন।

ছবি ম্যানুফেকচার করা হর। পুরনো আমল নোই যে গান হবে—তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে আঁকা? এই সময়ের গান হচ্ছে, তুমি কি নগ্ন ছবি? কম্পিউটারে আঁকা? হা হা হা।

মুহিব বলল, চাচী,আমি এর মধ্য দিয়ে যাব

তোমার বাবার সাত বছরের জুল হয়ে যাবে, তারপরেও যাবে না?

না।

হামিদুজ্জামান টেবিলের ওপর খানিকটা ঝুঁকে এসে বললেন, তুমি বরং এক কাজ করো আমার সঙ্গে কন্ট্রাক্টে আসি।

কী কন্ট্রাক্ট?

তোমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা আছে। সেখান থেকে চার লাখ আমাকে দাও। তোমাকে কিছুই করতে হবে না, নাকে সরিষার তেল কিংবা অলিভ ওয়েল যে কোনো একটা দিয়ে ঘুমাবে। আমার দায়িত্ব তোমার বাবাকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসা। আরো সহজ করে দেই। টাকা এখন দিতে হবে না। তোমার বাবা ছাড়া পেয়ে আসুক তারপর দিবে।

চাচা, আপনাকে কিছু করতে হবে না।

আমাকে যে পঞ্চাশ হাজার দিয়েছ সেটা কিন্তু গেল।

গেলে গেল।

তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয় নাই। তুমি কর কী?

আমি তেমন কিছু করি না। চাকরি খুঁজি।

পড়াশোনা কতদূর?

বিএ পাশ করেছি।

রেজাল্ট কী?

থার্ড ক্লাস।

বিবাহ করেছ?

না।

চা খাবে?

জি-না।

আরে বাবা, এক কাপ চা খাও। এত রাগ কেন? তোমার কাছে আমার আরেকটা প্রপোজাল আছে। আমি সরাসরি কথা বলতে পছন্দ করি। এখনো সরাসরি যা বলার বলব। ধানাইপানাই করে নষ্ট করার সময় আমার নাই।

মুহিব বলল, বলুন কী বলবেন।

আমার বিষয়সম্পত্তি অনেক। ঢাকা শহরে বাড়ি আছে তিনটা। চালু দোকান আছে দুটা। দুটাই বসুন্ধরা কমপ্লেক্সে। আমার একটাই মেয়ে। সে বেহেশতের দূর না, আবার খারাপও না। ফিজিক্সের মতো কঠিন বিষয়ে M.Sc, পড়ছে। অনার্সে ফার্স্টক্লাস পেয়েছে। আমার

মানিব্যাগে তার ছবি আছে। যদি চাও দেখাতে পারি। আমি নিজে অসৎ বলেই একজন অতি সৎ ছেলের সন্ধানে আছি। পাই না। বাংলাদেশে সব ধরনের পাত্র আছে, সৎপাত্র নাই। তুমি রাজি থাকলে আমি তোমার এবং তোমার পরবর্তী জেনারেশনের সব সমস্যার সমাধান করে দেব।

মুহিব বলল, চাচা, আমি উঠলাম। যা করার নিজেই করব।

হামিদুজ্জামান থুথুদানে থুথু ফেলতে ফেলতে বললেন, তুমি যা করবে তা হলো বুড়া বাপকে সাত বছর জেল খাটাবে।

মুহিব রাস্তায় কিছুক্ষণ এলোমেলো হাঁটল। বাবার সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। এখনো সময় হয় নি। আগে থেকে জেলখানার গেটে বসে থাকার মানে হয় না। সে দুটা বেদনা কিনল। আলাউদ্দিন স্বপ্নে দেখেছেন বেদানা খাচ্ছেন। আজকাল প্রায়ই তিনি স্বপ্নে নানান খাদ্যদ্রব্য খেতে দেখেন। মুহিবকে সেইসব কিনে নিয়ে যেতে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে মুহিব আজ দিনের কাজগুলি গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করল। ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হবে। নতুন একটা নাটক নিয়ে তিনি কথা বলবেন। লীলার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। একবার লীলাকে দেখে আসা দরকার। আজ শেষরাতে সে স্বপ্নে দেখেছে, লীলা তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। শাড়ি আঁচলে পেঁচিয়ে কঠিন ঝগড়া। মুহিব ঝগড়ার বিষয়টা মনে করার চেষ্টা করল। কিছুতেই মনে পড়ছে না। হঠাৎ কোনো একদিন মনে পড়বে।

লীলাকে একটা টেলিফোন কি করবে? তার মোবাইলে ক্রেডিট নেই বললেই হয়। মুহিব মনে মনে বলল, লীলা, আমাকে একটা টেলিফোন কর। প্লিজ লীলা কর। টেলিপ্যাথির মাধ্যমে যোগাযোগের চেষ্টা। হিমুর একটা বইয়ে এরকম আছে। হিমু এই ভঙ্গিতে যোগাযোগ করতে পারত। বাদলের সঙ্গে তার কথা বলা দরকার। সে চোখ বন্ধ করে বলত–বাদল। বাদল। সঙ্গে সঙ্গে বাদলের টেলিফোন।

মুহিবের টেলিফোন বাজছে। আশ্চর্য, লীলার টেলিফোন। লীলা বলল, আজ সন্ধ্যায় তুমি কী করছ?

মুহিব বলল, কেন বলো তো?

আজ রাতে তোমার নাটকটা দেখাবে। তোমাকে নিয়ে একসঙ্গে দেখতাম। তিনজন মিলে দেখব। আমি, তুমি আর আহসান সাহেব।

মুহিব বলল, না।

না কেন?

তোমাকে সঙ্গে নিয়ে নাটক দেখতে লজ্জা লাগবে।

নিজের নাটক নিজে দেখবে না?

নিলি ম্যাডাম দাওয়াত দিয়েছেন। আজ রাতে তাঁর বাসায় নাটকটা দেখব। নাটকের শেষে আমার কী সব ভুল হয়েছে তিনি ধরিয়ে দেবেন।

লীলা হাসছে।

মুহিব বলল, হাসছ কেন?

লীলা বলল, আমার ক্ষীণ সন্দেহ নিলি ম্যাডাম তোমার প্রেমে পড়েছেন। ছোট্ট উপদেশ দেই, উনার আকর্ষণী ক্ষমতা প্রচণ্ড। তুমি আবার বিপদে পড়ে যেও না।

মুহিব বলল, বিপদে পড়ব না, কারণ নিলি ম্যাডাম কাউকে বিপদে ফেলার মানুষ না।

লীলা বলল, বাসায় চলে এসো। আহসান সাহেব ছাদে একটা বাগান তৈরি করে দিয়েছেন। এত সুন্দর হয়েছে।

মুহিব বলল, এখন আসতে পারব না। বাবার কাছে যেতে হবে। তাকে বেদানা খাওয়াতে হবে। তিনি বেদানা খেতে চাচ্ছেন। লীলা রাখি?

আলাউদ্দিন বেদানার দানা ভেঙে ভেঙে মুখে দিচ্ছেন। আগ্রহ নিয়ে চাবাচ্ছেন। তাকে কেন জানি খুব অসহায় লাগছে। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে। চোখের দৃষ্টি ছানিপড়ার মতো।

আলাউদ্দিন বললেন, তোর পিতা কি বাংলার লট? এক কথায় পঞ্চাশ হাজার টাকা হামিদুজ্জামানকে দিয়ে চলে এসেছিস? আশেপাশে লোকজন না থাকলে এখনই থাপড়ায়ে তোর চাপার দাঁত ফেলে দিতাম। এক্ষণ তাঁর কাছে যাবি। পা ধরে পড়ে থাকবি। বলবি, চাচা মাথা গরম ছিল, ভুল করেছি। আপনি ছাড়া গতি নাই।

মুহিব বলল, উনি তখন নতুন শর্ত দেবেন। বলবেন আমার মেয়েকে বিয়ে কর।

বিয়ে করবি। বিয়ে তো করতেই হবে। তুই তার সঙ্গে কন্ট্রাক্টে চলে যা। তুই বল, আপনি বাবাকে রিলিজ করে নিয়ে আসুন। বিনিময়ে আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করব। বাপের জন্যে এই সামান্য কাজটা করতে পারবি না? কথা বলছিস না কেন? পারবি না? না-কি কারো সাথে এর মধ্যে লদকালদকি প্রেম হয়ে গেছে? বেকার ছেলে আর কিছু পারুক না-পারুক প্রেমটা পারে। তার জন্মই নেয় রোমিওজুলিয়েটের রোমিও হিসেবে। তার চেহারা দেখেই বুঝেছি জটিল প্রেম। নাটকের মেয়ে? তুই তো আবার শুনেছি নাটকে নেমেছিস। নাটকের মেয়েগুলি তো প্রেমের জন্যে জিহ্বা লম্বা করেই রাখে। মেয়েটার নাম কী? নাম বল।

মুহিব বলল, নাম জেনে কী করবে?

আলাউদ্দিন হতাশ গলায় বললেন, তাও তো কথা। আমি নাম জেনে কী করব? নাম দিয়ে তুই তসবির মতো জপ করবি। আমার কী? নাম ফুলকুমারী হলে যা, গাধাকমারী হলেও তা।

সেন্ট্রি ঘরে ঢুকে বলল, আপনাদের সময় শেষ। এখন যান।

আলাউদ্দিন বললেন, বাবারে, আসল কথাই তো বলা হয় নাই।

সেন্ট্রি বলল, নকল কথা যা বলেছেন তাতেই হবে।

লীলা টিভির সামনে বসে আছে। লীলার পাশে আহসান। কিছুক্ষণ আগে নাটক শেষ হয়েছে। লীলা চোখে রুমাল চেপে বসে আছে। তার কান্না শেষ হয় নি, এখনো তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে।

আহসান বলল, আমি নাটক-সিনেমা বুঝি না, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, মুহিবের অভিনয় অসাধারণ। সে তার ব্যক্তিগত হতাশা ছড়িয়ে দিতে পেরেছে। যখন সে হাসতে হাসতে বলল, আমি চলে যাচ্ছি—কিন্তু আমি চাই তোমার সুন্দর সংসার হোক। তোমার উঠানে তোমার ছেলেমেয়েরা খেলা করুক। তখন তার হাসিতে কান্না ঝরে পড়ছিল। যদিও ডায়ালগ সস্তা ধরনের হয়েছে। তারপরেও।

লীলা বলল, রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুটা লাইন বললে অনেক সুন্দর হতো—

আমি বর দিনু দেবী তুমি সুখী হবে
ভুলে যাবে সর্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

আহসান বলল, রবীন্দ্রনাথ ছাড়াই কিন্তু ইমোশন তৈরি হয়েছে। এ তো কম কথা না। মুহিবকে টেলিফোন কর।

লীলা বলল, না।

আহসান বলল, না কেন?

মুহিব এখন আছে তার অতি পছন্দের একজন মানুষের সঙ্গে। তার নাম নিলি। এর মধ্যে আমি উপস্থিত হব না।

নিলি বলল, আমি একটা ভুল করেছি। এত সুন্দর নাটক হয়েছে। আপনার উচিত ছিল লীলাকে পাশে নিয়ে দেখা। আমি একটা তুচ্ছ অজুহাতে আপনাকে আটকে রেখেছি। সরি। আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলছি। আপনি লীলার কাছে যান। বিশাল একটা ফুলের তোড়া কিনবেন। চকলেট কিনবেন। এবং তাকে একটা বিশেষ কথা খুব গুছিয়ে বলবেন।

কী কথা বলব?

আমি বলে দিচ্ছি কী বলবেন। আজ যতটা সুন্দর করেছেন, লীলার সঙ্গে অভিনয় যেন তারচেয়ে সুন্দর হয়। কথাগুলি যেন হৃদয়ের গভীর থেকে বের হয়ে আসে। পারবেন না।

পারব।

সূচিপত্র

আপনি বলবেন, লীলা! আমি নিতান্তই দরিদ্র একজন ছেলে। চোখে আশা এবং স্বপ্ন ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আমার চারদিক অন্ধকার। তবে আমার বিশ্বাস, তুমি যদি একটা মশাল হাতে আমার পাশে এসে দাড়াও আমি অনেক দূর যাব। বলতে পারবেন?

জি মাডাম, পারব।

অভিনয় করে দেখান। মনে করুন এটা চকলেটের বাক্স। আর এই হচ্ছে ফুল। মনে করুন আমি লীলা। কলিংবেল বেজেছে। আমি দরজা খুললাম, ক্যামেরা রোল করছে। অ্যাকশান।

মুহিব কথাগুলি বলল। তার চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে গেল। সে একবার চোখও মুছল।

নিলি বলল, খুব সুন্দর হয়েছে। ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে। একটা পর্যায়ে লীলার হাত ধরা প্রয়োজন ছিল। মূল জায়গায় ভুলটা করবেন না।

মুহিব বলল, ভুল করব না।

নিলি বলল, একটি মেয়ের ভালবাসাকে আমি যুদ্ধের ট্যাংকের মতো মনে করি। সত্যিকার প্রেমিক-প্রেমিকা ট্যাংকের কঠিন বর্মের ভেতর থাকে। কোনো চড়াইউতরাই ট্যাংককে আটকাতে পারে না। আমার কথা না। আমি এত গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। মনে হয় আর্নেস্ট হেমিংওয়ের কথা। উপন্যাসের নাম ফেয়ারওয়েল টু দা আর্মস কিংবা ফর হুম দা বেল টেলস।

মুহিব লীলাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ফুল নেই। চকলেটের বাক্সও নেই। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে বলে কিনতে পারে নি। মুহিব লীলাদের বাড়িতে ঢুকছে না। কারণ গাড়িবারান্দায় আহসান সাহেবের প্রকাণ্ড গাড়িটা দেখা যাচ্ছে।

আজ সারাদিন বৃষ্টির ছিটেফোঁটা ছিল না। এখন টিপটিপ করে পড়তে শুরু করেছে। আহসানের গাড়ি গেট দিয়ে বের হচ্ছে। মুহিব উল্টোদিকে তাকাল যেন তাকে দেখা না যায়। গাড়ি মুহিবের সামনে এসে থামল। গাড়ির কাচ নামিয়ে আহসান মুখ বের করল।

মুহিব সাহেব, লীলার কাছে যাবেন তো? চলে যান। এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আপনার নাটক দেখে লীলা খুব কেঁদেছে। আমারও চোখের পানি ফেলার ইচ্ছা ছিল। পুরুষমানুষ বলে ফেলতে পারি নি। পুরুষদের errotion দেখানোর অনেক limitation. গাড়িতে উঠুন, আপনাকে নিয়ে একটা লং ড্রাইভ দেব, তারপর নামিয়ে দেব লীলাদের বাড়ির সামনে।

মুহিব গাড়িতে উঠল।

গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটছে। আহসান নিচু গলায় গল্প করছে।

আহসান বলল, লীলার সঙ্গে আমার পরিচয়ের শুরুটা কি জানেন? আপনাদের পরিচয়ের শুরুটা জানি। নর্দমায় পরিচয়। আমাদের সেরকম না। তবে সেই পরিচয়ও ইন্টারেস্টিং। বলব?

বলুন।

আমি তখন ক্লাস নাইনে পড়ি। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ রাস্তার একটা নেড়ি কুকুর আমাকে তাড়া করল। ভয়ে এবং আতঙ্কে অস্থির হয়ে একটা খোলা গেট দেখে ঢুকে পড়লাম। ততক্ষণে কুকুরটা আমাকে কামড়ে ধরেছে। সেই বিশাল বাড়ির বারান্দায় অতি রূপবতী এক বালিকা কী যেন করছিল। আমি আশ্রয়ের জন্যেই বোধহয় মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। কুকুরটা আমাকে কামড়াল। মেয়েটাকে কামড়ালি। মেয়ের মা আমাদের উদ্ধার করতে এলেন, তাকেও কামড়াল। ঐ মেয়েই লীলা।

লীলার মা আপনাকে খুব পছন্দ করতেন?

আহসান বলল, হ্যাঁ। উনি বলতেন, পাগলা কুকুর তাড়া করে আমার মেয়ের জামাইকে আমার ঘরে ঢুকিয়েছে।

মুহিব বলল, লীলার সঙ্গে আপনার পরিচয়ের গল্পটা খুব সুন্দর।

আহসান বলল, গল্পটা চমৎকার, কারণ গল্পটা মিথ্যা। লীলার সঙ্গে প্রথম দেখার অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত সিনারিও আমি কল্পনা করি। তারই একটা আপনাকে বললাম। আবার যেদিন দেখা হবে সেদিন আরেকটা বলব। আপনার সঙ্গে আমার কিছু মিলও আছে। আপনি যেমন গভীর রাতে লীলাদের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন, আমিও থাকি। তফাত একটাই, আপনি থাকেন রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আমি থাকি দামি গাড়ির ভেতর। চলুন আপনাকে লীলার কাছে দিয়ে আসি।

৭. ব্রাউন পেপারে মোড়া টাকা

ব্রাউন পেপারে মোড়া টাকা টেবিলের ওপর রাখা। মুহিব সালমার বাবা আশরাফ সাহেবকে বলল, টাকাটা নিয়ে এসেছি। আপনি পাঁচ লাখ চেয়েছেন, এখানে চার লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। বাকিটা আমি এক মাসের মধ্যে দেব।

আশরাফ কিছুক্ষণ ব্রাউন পেপারের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে নিজের মনে কী যেন বললেন। ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি সবই প্রতিবন্ধীদের মতো। তিনি এখন তাকিয়ে আছেন তার সামনে রাখা গ্লাসভর্তি সবুজাভ পানীয়ের দিকে। গ্লাসের পাশে পিরিচে একটুকরা লেবু কাটা। তিনি বললেন, গ্লাসে আছে চিরতার পানি। ভোরবেলা খালি পেটে একগ্লাস চিরতার পানি খেয়ে লেবু দিয়ে মুখশুদ্ধি যে করে তার রোগবালাই হয় না।

মুহিব বলল, ও।

আশরাফ বললেন, আরেকটা মহৌষধ হলো কালিজিরা। হাদিসে আছে— মৃত্যুরোগ ব্যতীত সর্বরোগের মহৌষধ কালিজিরা।

মুহিব বলল, চাচা, টাকাটা রাখুন। আপনি বলেছিলেন মামলা তুলে নিবেন। আপনাকে আর আপনার মেয়েকে কোর্টে যেতে হবে। আমি টেক্সিক্যাব নিয়ে এসেছি।

আশরাফ মুহিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে খারাপ ভাবছ?

মুহিব বলল, জি-না।

আশরাফ বললেন, মুখে না বললেও মনে মনে অবশ্যই ভাবছ। তবে বাবা শোন, আমি কিছুদিন সৌদিতে ছিলাম। সেখানে দেখেছি টাকার বিনিময়ে অপরাধ ক্ষমা করা হয়। কেউ যদি খুনও করে, রক্ত ঋণ দিলে তারও ক্ষমা হয়। এই কারণেই তোমার কাছে টাকা চেয়েছিলাম। আমি অতি দরিদ্র ব্যক্তি। ভিক্ষুকের কাছাকাছি।

মুহিব বলল, চাচা, টাকাটা রাখুন।

আশরাফ বললেন, বাবা, টাকাটা আমি রাখতাম, কিন্তু বড় একটা সমস্যা হয়েছে। আমার মেয়ে আমার কাছে স্বীকার করেছে, এই জাতীয় কোনো ঘটনা ঘটে নাই। হিশাম সাহেবের আদেশে সে কাজটা করেছে। নিজেই দৌড় দিয়ে আলাউদ্দিন সাহেবের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার শুরু করেছে। দরজা ভেঙে তাকে সবাই বের করেছে। সে অজ্ঞান হবার ভান করেছে। বাবা, অত্যন্ত লজ্জার একটা ঘটনা। আমার মেয়েকে আল্লাহপাক এই কারণে কঠিন শাস্তি দিবেন। নবিজীর শেফায়াত সে পাবে এরকম মনে হয় না।

মুহিব আগ্রহ নিয়ে বলল, তাহলে তো চাচা, ঘটনা অনেক সহজ হয়ে গেল। আপনার মেয়ে কোর্টে গিয়ে আসলে কী ঘটেছে সেটা বলবে। আমার বাবা ছাড়া পাবেন।

আশরাফ চুকচুক করে তার সামনে রাখা চিরতার পানি সবটা খেলেন। মুখে লেবুর টুকরা দিয়ে থেমে থেমে বললেন, এই কাজটা আমার মেয়ে করবে না। মেয়েটা নষ্ট হয়ে গেছে। হিশাম মেয়েটাকে নষ্ট করেছে। হিশাম বিপত্নীক মানুষ। সালমাকে বিয়ে করবে— এইরকম লোভ দেখাচ্ছে। সালমা এখন তার সঙ্গেই থাকে। কিয়ামতের আগে আগে এই ধরনের পাপাচার হয়। কেয়ামত নজদিক।

মুহিব বলল, ঘটনা কী ঘটেছে আপনি যদি কোর্টে গিয়ে বলেন তাহলেও মনে হয় হবে।

আশরাফ বললেন, আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব না। আমি হিশামের আশ্রয়ে বাস করি। তবে আমি খাস দিলে তোমার পিতার জন্য দোয়া করব। বিচারকের দিলে যেন রহম হয়, তার জন্যে রোজা খব। এবং কোরান খতম দিব। বাবা, তোমাকে কি এক গ্লাস চিরতার পানি দিতে বলব? শরীরের জন্যে অত্যন্ত উপকারী। সারাদিনের নানান কর্মকাণ্ডে শরীরে যে বিষ উৎপন্ন হয়, সব নষ্ট করে দেয়।

মুহিব উঠে পড়ল। এর সঙ্গে কথা বলার আর কিছু নাই।

মুহিব গেল হামিদুজ্জামানের কাছে। হামিদুজ্জামান বললেন, ঘুরে ফিরে সেই আমার কাছে?

মুহিব বলল, জি চাচা।

টাকা এনেছ? না-কি empty handed?

টাকা এনেছি। এখানে সাড়ে চার লাখ আছে।

চার চেয়েছিলাম, সাড়ে চার এনেছ কেন?

মুহিব কিছু বলল না। হামিদুজ্জামান মানিব্যাগ খুলে তার মেয়ের ছবি বের করলেন। ছবি এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, মেয়ে দেখতে কেমন বলো।

জি সুন্দর।

সুন্দর কিছু দেখলে বলতে হয় মাশাল্লাহ। বলো মাশাল্লাহ।

মুহিব বলল, মাশাল্লাহ।

মেয়ের ডাকনাম মায়া। তোমার নামের সঙ্গে মিল আছে। তুমি মুহিব, সে মায়া। স্বামী-স্ত্রীর নামের মিল থাকলে সংসার সুখের হয়। মায়ার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে চাও?

জি-না।

সামনাসামনি কথা বলতে চাইলে গাড়ি পাঠিয়ে তাকে আনাই?

মুহিব বলল, চাচা, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করব না। আপনি যা টাকা চেয়েছেন, আপনাকে দিলাম। বাবাকে বাঁচান। বিনা অপরাধে উনার জেল হলে দুঃখেই আমার বাবা মারা যাবেন।

৮. লীলার হাতে ফুলের মালা

আঠারোই এপ্রিল, রবিবার, দ্রুত বিচার আইনে আলাউদ্দিনের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল। বিচারক তার রায়ে মানুষ গড়ার কারিগর শিক্ষক সমাজের নৈতিক অধঃপতনের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, শাস্তি আরো কঠোর করার ইচ্ছা ছিল। আসামির বয়স এবং স্বাস্থ্য বিবেচনা করে লঘু দণ্ড দেয়া হয়েছে।

পরিশিষ্ট

আজ বুধবার।

মুহিবের মিথ্যাদিবস। সে অপেক্ষা করছে জেলখানার গেটে অজ তার বাবা আলাউদ্দিন মুক্তি পাবেন। তার সাজার মেয়াদ শেষ হয়েছে।

মুহিবের পাশে লীলা দাঁড়িয়ে আছে। লীলা বলল, বাবার জন্যে একটা ফুলের মালা আনার দরকার ছিল না?

মুহিব বলল, বাবা কোনো রাজনৈতিক নেতা না লীলা যে ফুলের মালা গলায় দিয়ে তাকে বের করতে হবে।

দীর্ঘদিন অন্যায় শাস্তি তিনি ভোগ করেছেন। একটা ফুলের মালা তার অবশ্যই প্রাপ্য।

এখন ফুলের মালা আমি পাব কোথায়?

লীলা বলল, ফুলের মালা আমি নিয়ে এসেছি।

গুড।

লীলা বলল, আমাকে কি তোমার বাবা পছন্দ করবেন?

মুহিব বলল, না। উনি কাউকেই পছন্দ করেন না। তবে দীর্ঘদিন জেলে থেকেছেন। তার মানসিকতা বদলাতেও পারে।

লীলা বলল, আজ যে তোমাকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছে সেটা কি তুমি জানো?

মুহিব বলল, এখন জানলাম। লীলা বলল, তোমার কেমন আনন্দ হচ্ছে একটু বলবে?

মুহিব বলল, বাবা ঘরে ফিরবেন। আগের মতো আমাকে গাধাপুত্র বলে গালি দেবেন, ভাবতেই ভালো লাগছে।

লীলা বলল, Home এর defination কি মনে আছে? তোমাকে শিখিয়েছিলাম।

মুহিব বলল, Home is the place where if you want to go there, they have to take you in.

লোকজন মুহিবকে চিনতে পেরেছে। তাকে ঘিরে ভিড় বাড়ছে। ক্রমাগত মোবাইল ক্লিক ক্লিক করছে। ছবির পর ছবি উঠছে। ভিড় সামলানোর জন্যে পুলিশ এসেছে। পুলিশের ওসি ওয়াকিটকিতে আরো কিছু পুলিশ চেয়েছেন। ওসি সাহেব মুহিবকে বললেন, স্যার, আপনি গাড়িতে বসুন। সব কন্ট্রোল করা যাবে না। পাবলিকের বিশ্রী স্বভাব, সেলিব্রেটি দেখলে হুশ থাকে না।

মুহিবের মা এবং বোন জেলগেটে আসে নি। অশ্রুর বিয়ে হয়েছে। সে স্বামীর সঙ্গে রাজশাহীতে থাকে। তাদের একটা মেয়ে হয়েছে। মেয়ের নাম মুহিব রেখেছে নিলি। এই নাম অশ্রু বা অশ্রুর স্বামীর কারোই পছন্দ হয় নি। মুহিব বলেছে—এই নামের মেয়ের হার্ট হয় পৃথিবীর মতো বড়। নামটা রেখে দেখ! অশ্রু স্বামী এবং মেয়েকে নিয়ে ভোরবেলা ঢাকা পৌঁছেছে। নিলির সামান্য জ্বর এসেছে বলে তারা আসে নি। অশ্রুর স্বামীর নাম সাজ্জাদ। তার ভুবনে স্ত্রী এবং মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নেই। মাঝে মাঝে অশ্রুর খুবই বিরক্ত লাগে। সে বলে, আমি খাটের নিচে যে ভূতটা দেখতাম তুমি তারচেয়ে খারাপ। ভূতটা শুধু রাতে থাকত। তুমি দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা থাক। ভূতটার চেহারার সঙ্গে তোমার মিল আছে। ভূতটার মাথায় চুল ছিল না। তোমার মাথায় টাক। ভূতটার মুখ ছিল লম্বা, তোমার মুখও লম্বা। কোনো কথাতেই সাজ্জাদের কিছু হয় না। সাজ্জাদের ধারণা, অশ্রু যখন বেশি রাগারাগি করে তখন তার চেহারা অনেক সুন্দর হয়ে যায়। তার দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগে।

রাজিয়া বেগম জেলগেটে যান নি। কারণ তার অনেক কাজ। মানুষটা কতদিন পরে ঘরে আসবে। ঘরের ভাত খাবে। দীর্ঘ ছয় বছরের জেলখানায় এক বছর শাস্তি রেয়াত হয়েছে,

জেলের বছর নয় মাসে হয়) কত কথা জমা আছে। কোনটার পর কোনটা বলবেন সেটা একটা সমস্যা।

অশ্রুর বিয়ের দিন কত বড় ঝামেলা হলো। বিয়ে ভেঙে যায় ভেঙে যায় অবস্থা। তারপর হঠাৎ করেই সব সমস্যার কী আশ্চর্য সমাধান! অশ্রুর স্বামীকে শুরুতে তার পছন্দ হয় নি। বুড়োটে চেহারা। মাথায় চুলের বংশও নাই। কথাবার্তাও যেন কেমন কেমন। অর্ধেক কথা বলে তো অর্ধেক বলে না। এখন মনে হচ্ছে, এরকম জামাই পাওয়া যে-কোনো মেয়ের জন্যেই ভাগ্যের কথা।

হিশাম সাহেবের গল্পটা গুছিয়ে বলতে হবে। সালমা মেয়েটাকে বিয়ে করেছে। ধুমধাম করে। বিয়ের কার্ড দিতে এসেছিল। কী সুন্দর সুন্দর কথা–ভাবি মেয়েটাকে উদ্ধারের জন্যে এই কাজটা করলাম গাঁয়েক গছে কে এই মেয়েকে বিয়ে করবে বলুন?

মুহিবের ফ্ল্যাট কেনার ঘটনাটা সুন্দর করে বলতে হবে। ঘটনা বলতে গিয়ে আগপিছ হয় কি-না সেই ভয়ও আছে। আগপিছ হলে ঘটনার মজাই শেষ হয়ে যাবে। একদিন মুহিবকে নিয়ে গেল। ফ্ল্যাট দেখাতে সে চারতলার একট ফ্ল্যাট কিনেছে। এখনো লিফট বসে নি। তিনি বললেন, বাবারে, আমি তো সিঁড়ি বাইতে পারব না। মুহিব বলল, কোনো চিন্তা নাই মা। আমি কোলে করে তুলব।

রাজিয়া বললেন, পাগল না-কি? তুই কোলে করে তুলবি কীভাবে?

মুহিব বলল, দেখ না কীভাবে তুলি। সত্যি সত্যি সে তাঁকে কোলে করে চারতলায় তুলে বলল, সবচেয়ে সুন্দর ঘর ঘর কোনটা মা খুঁজে বের কর। তিনি খুঁজে বের করলেন।

বারান্দাওয়ালা বিরাট ঘর। দক্ষিণ দিকে জানালা। সারাক্ষণ হাওয়া আসছে। মুহিব বলব, মা, এই ঘরটা তোমার আর বাবার। এই ঘরের পাশের ঘরটাও তোমার। বাবার সঙ্গে যখন রাগারাগি হবে, তখন এই ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমাবে।

মুহিব তার বাবার ঘরটা আগের মতো করে সাজিয়েছে। পুরনো চটি জুতা। পুরনো কাপড়। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো মুহিবের ছেঁড়া BA-র সার্টিফিকেট। টিভি নষ্ট হয়ে গেছে বনে টিভি কেনা হয়েছে। একটা বেতের ইজিচেয়ার কেনা হয়েছে। ঘরে এসি লাগানো হয়েছে। মানুষটা যেন এসির বাতাসে আরাম করে ঘুমাতে পারে।

রাজিয়া বেগম দুপুরের খাবার আয়োজন করছেন। কাজের ছেলেটি বাজার নিয়ে এসেছে। ঘরে রান্নার মেয়ে আছে। রাজিয়া ঠিক করেছে আজ নিজেই রাঁধরেন। সবই মুহিবের বাবার পছন্দের খাবার।

করল ভাজি (সঙ্গে কুচি কুচি আলু দিতে হবে। অল্প ভাজা হবে, যেন করলা সবুজ থাকে।)

সাজন (সর্ষে বাটা দিয়ে, সঙ্গে কাঁচামরিচ।)

কৈ মাছের ঝোল (টমেটো দিয়ে। কাঁচা টমেটো পেলে ভালো হয়।)

মাষকালাইয়ের ডাল (সঙ্গে টাকি মাছ দিতে হবে।)

রাতে করবেন হাঁসের মাংস। চালের আটার রুটি।

মুহিবকে ঘিরে ভিড় প্রচণ্ড বেড়েছে। ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়েছে। লীলা ডানে সরতে সরতে ঝুপ করে নোংরা নর্দমায় পড়ে গেল। পুরনো দিনের কথা মনে করে খিলখিল করে হেসে ফেলল। প্রকৃতি বড়ই অদ্ভুত। প্রকৃতি পুনরাবৃত্তি পছন্দ করে।

আলাউদ্দিন জেলগেট থেকে বের হয়েছেন। মুহিব ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

আলাউদ্দিন বলেন, নর্দমায় পড়ে আছে মেয়েটা কে?

মুহিব বলল, বাবা, ও তোমার বৌমা। ওর নাম লীলা।

আলাউদ্দিন ছেলেকে কঠিন ধমক দিলেন, বৌমা নর্দমায় পড়ে আছে, তুই তাকে তুলবি না? গাধা। অর্ধমানব।

লীলার হাতে ফুলের মালা। সে চেষ্টা করছে মালায় যেন নোংরা না লাগে।

———-